সুখে দুঃখে সমবেদনা দেখাইতে লাগিলেন। এককথায় মুসলমানগণ হিন্দুদের ভ্রাতৃভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের শঙ্খঘণ্টা বাজিতে লাগিল। মহরম, ইদ, সবেবরাতে সহিত দোল দুর্গোৎসবের উৎসব সমানভাবে চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহাদের উভয় জাতির মাতৃভাষাও এক হইয়া পড়িল।

মুসলমানগণের আমলে বঙ্গদেশের অনেক উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের দীনা বঙ্গ-ভাষার সমধিক উন্নতি হইয়াছিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

নববিজয়ী মুসলমানগণের উদ্যোগে, উৎসাহে, অশ্রদ্ধায় লুপ্ত প্রায়, হতাদরে মৃতপ্রায় বঙ্গভাষার যতদুর উন্নতি হইয়াছিল, তাহা যতদিন ভারতে ইতিহাস আলোচনা রহিবে, যতদিন বাঙ্গলা ভাষার অস্তিত্ব বর্ত্তমান রহিবে, ততদিন তাহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিবে। এবিষয়ে শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহারই প্রতিধ্বনী করিয়া উপরোক্ত বিষয়ের সারবত্তা প্রমাণ করাইব। তিনি লিখিয়াছেন, "যে সকল কারণে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষিত ব্রাহ্মণ শ্রেণীর আদরণীয় হইয়া উঠিল, তাহার প্রধানতম কারণ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ভারত বিজয়। বঙ্গ ভাষা যে সহসা শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদরনীয় হইয়া উঠিল, মুসলমান কর্ত্তৃক ভারত বিজয়ই তাহার একটা সর্ব্ব প্রধান কারণ।

হিন্দু রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিলে বঙ্গ ভাষাকে বহুকাল অনাদৃত অবস্থায় থাকিতে হইত। পাল ও সেন রাজার আমলে এ ভাষার কোন শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।" ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পৈশাচিক প্রাকৃতের অপভ্রংশ বাঙ্গলা ভাষাকে একান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। হিন্দুরাজা ও হিন্দু জমীদারগণের সভায় সংস্কৃত পুরাণ পাঠও "ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন কোমল-মলয়-সমীরের ন্যায় পদাবলী আলোচনা হইত। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষার প্রতি নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এমন কি তাহার আলোচনা করিলেও নিরয়গামী হইতে হইবে বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

মুসলমানগণ বঙ্গভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি না দেখাইলে, ভারতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত, যাহা আজি প্রতি ঘরে ঘরে সামান্য লেখাপড়া জানা স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তৃকও পঠিত হইতেছে, তাহা টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের পুথীর মধ্যেই পড়িয়া থাকিত। তুমি আমি বা পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকেরা তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতেন। নসির খাঁ নামক একজন মুসলমান সম্রাট গৌড়ে ১৩২৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি একজন বঙ্গভাষার প্রকৃত উৎসাহ ও সাহায্য দাতা ছিলেন ও ঐ মহাত্মা প্রথমে মহাভারত বঙ্গভাষায় অনুদিত করেন। সেই মহাভারত আজ কাল প্রচলিত না থাকিলে ও পরবর্ত্তি লেখক কর্ত্তৃক তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা,—

"শ্রীযুত নায়ক যে নশারত খান।
রচাইল পাঁচালী যে গুণের নিদান।"

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ঐ পুস্তক ও পরাগল খাঁ

নামক একজন মুসলমান বিদ্যোৎসাহীর আদেশে রচিত হইয়াছিল। যে কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ আজ সর্ব্বত্র প্রচলিত সেই কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ ও মুসলমান সম্রাটের অনুমতি ও উৎসাহ ক্রমে লিখিত হইয়াছিল। কীর্ত্তিবাস ১৪৪১খৃঃ অব্দে শ্রীপঞ্চমীর দিন ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৌড়েশ্বরের আদেশে রামায়ণের অনুবাদ করেন। এজন্য গৌড়েশ্বর তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কবি ইহার জন্য প্রশংসা ভিন্ন এক কপর্দ্দক ও দান গ্রহণ করেন নাই। এই সময় গৌড়ের রাজতক্তে সম্রাট হুসেন সাহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলা-উদ্দীন হুসেন সাহ একজন প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী ও কাব্যামোদী সম্রাট ছিলেন। তাঁহার রাজ-ত্বের সময় হিন্দুদের উন্নতির যুগ আরম্ভ হইয়া-ছিল। তিনি হিন্দুদিগকে আপনার জন ভাবিয়াছিলেন। হুসেন সাহের প্রশংসা সূচক অনেক কবিতা পুরাতন পুস্তকে দেখা যায় *। এই মহাত্মা মুসলমান নৃপতি শুধু কৃত্তিবাস কর্ত্তৃক রামায়ণের অনুবাদ করাইয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি কুলীন গ্রাম নিবাসী মালাধর বসুকে ভাগবতের অনুবাদে নিযুক্ত করেন। ইনিই ভাগবতের আদি অনুবাদক। সাত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৪৭৩ খৃঃ অব্দে ইনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ লেখেন। গুণগ্রাহী নৃপতি কবির পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দান করেন। ১৪৮০ খৃঃ অব্দে কুলীন গাঁর উক্ত কবি "শ্রীশ্রী কৃষ্ণ বিজয়" নামক বঙ্গভাষায় সর্ব্ব প্রথম দীর্ঘ কাব্য রচনা করেন।

হুসেন সাহ ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে গৌড়ের রাজ-তক্ত অধিকার করেন। তাহা হইলে খুব সম্ভব কৃত্তিবাস ৫৭।৫৮ বৎসর বয়সের সময় হুসেন সাহ কর্ত্তৃক রামায়ণের অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েন। রামায়ণের অনুবাদ শেষ করিতে অতিবৃদ্ধ হইয়াছিলেন। কারণ, একখানি পুথির শেষে ভণিতায় দৃষ্ট হয়, "রচিলা কৃত্তিবাস জীর্ণ শীর্ণ কলেবর।"

ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসুর ভ্রাতা গোপীনাথ বসু হুসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মালাধর বসুর ভাগবত কিরূপ উপাদেয় হইয়াছিল সে বিষয়ে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, স্বয়ং ভগবানাবতার শ্রীশ্রীচৈত-ন্যদেব তাঁহার ভাগবত পাঠ করিয়া তৃপ্ত হই-তেন। ইহা বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখ আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহার মূলে মুসলমান নৃপতি বর্ত্তমান। হুসেন সাহের প্রধান সেনাপতি পরাগল খাঁও সম্রাটের পদাঙ্ক অনু-সরণ ক্রমে কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে মহাভারতের অনুবাদে নিয়োগ করেন। পরাগল খাঁ শুধু আদেশ, দিয়াই বঙ্গভাষার উন্নতির বিষয়ে

---

* ১ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে, ইনি চৈতন্যের ভক্ত হইয়াছিলেন।

২ 'সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক।" বিজয় গুপ্ত

৩ কবীন্দ্র পরমেশ্বর ইহাকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া লিখিয়াছেন।

৪ সাহহুসেন, জগৎভূষণ, সেই এহি রসজানে। পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর, ভণে যশোরাজ খানে।"

৫ প্রবন্ধ লেখক কর্ত্তৃক লিখিত আলাউদ্দীন হুসেন সাহ নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য। এই পুস্তক এক্ষণে যন্ত্রস্থ।

কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, তিনি নিজেও মহাভারতের কোন কোন অংশ লিখিয়াছেন।

এইরূপে মুসলমান নৃপতিগণ কর্ত্তৃক যখন দীনা বঙ্গভাষার উন্নতির আয়োজন চলিল, তখন নির্লজ্জ বাঙ্গালীগণ আর কিরূপে নিশ্চেষ্ট থাকিবেন? তাই তাঁহারাও তখন হইতে বঙ্গ ভাষার উন্নতি বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। মুসলমান সম্রাটগণের অনুসরণ ক্রমেই আমরা দেখিতে পাই, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় ভারতচন্দ্রের স্থান। বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের আশ্রিত ঘনরাম, যশোমন্ত সিংহের প্রাসাদে রামেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনে বদ্ধ পরিকর। একটী চলিত কথা আছে "বিনাশ্রয়ে ন জীবন্তি পণ্ডিতা, বণিতা লতাঃ।' প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে একথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু রাজগণ কর্ত্তৃক অনুগ্রহ লাভও প্রথমে মুসলমান সম্রাটগণ কর্ত্তৃক হইয়াছিল। পরে দেশের রাজারাও সেই প্রথা অনুসরণ করেন। নতুবা হয়ত আজ বঙ্গভাষা কোন্ অন্ধতম কূপে পড়িয়া থাকিত-তাহার নির্দ্দেশ করা কঠিন।

শুধু মুসলমান সম্রাটগণ কর্ত্তৃক সাহায্য ও উৎসাহ প্রাপ্ত হিন্দু কবিগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া বঙ্গ ভাষার উন্নতি হইলেই, মুসলমানগণ কর্ত্তৃক সমূহ সাহায্য প্রাপ্ত হইত; কারণ তখন কেহই বঙ্গ ভাষায় পুস্তকাদি লিখিতে সাহস পাইত না, সেরূপ করিলে অনেককেই জাতিচ্যুত হইতে হইত। কিন্তু ইহা ছাড়া মুসলমানগণ অনেকেই নিজে লেখনি ধারণ করিয়া বঙ্গভাষার অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা প্রবন্ধ বিস্তৃতির ভয়ে এখানে মাত্র কয়েকজন মুসলমান কবির কথা বলিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

তিন শত বৎসরের অধিক হইল রোসাঙ্গের (আরকান) রাজকবি দৌলত কাজীর লিখিত 'সতীময়না বা লোরচন্দ্রাণী' একখানি বঙ্গভাষায় বিখ্যাত ও উপাদেয় পুস্তক। রোসাঙ্গরাজ রুদ্র-ধর্ম্ম একজন প্রকৃত সাহিত্য অনুরক্ত বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সভা বিস্তর কবি দ্বারা সমলঙ্কৃত ছিল। মহামতি মাগন ঠাকুর, সৈয়দ মহম্মদ খাঁ, সৈয়দমুসা, শ্রীমন্ত সোলেমান, নবরাজ মজলিস, লস্কর উজীর, আসরকখান, সৈয়দ সউদ সাহ ইহারা সকলেই রাজ সভায় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের সভা যেমন নবরত্নে শোভিত ছিল, রোসাঙ্গের রাজসভাও সেইরূপ উক্ত কবিগণ কর্ত্তৃক উজ্জলীকৃত থাকিত। দৌলত কাজী "লোরচন্দ্রাণী" নামক পুস্তকের অর্দ্ধাংশ লেখেন। এই পুস্তকখানি বঙ্গভাষায় মধ্যে রচনা বিষয়ে একখানি রত্ন বিশেষ। ইহার সুমধুর পদাবলী পাঠকরিলে, মুসলমান কবির বঙ্গভাষার দখল বিষয়ে মুগ্ধ হইতে হয়। আমরা উক্ত পুস্তক পাঠে এতই মুগ্ধ হইয়াছি যে, এস্থলে পাঠকগণকে তাহার একটু রসাস্বাদন না করাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। "লোরচন্দ্রাণী" পুস্তকের ঋতু বর্ণনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা, আমিয়া সেইস্থান হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

(১) নব শীত ঘন    কেশ মলয় মার্জ্জন
রঞ্জিত তরল কুঞ্জে।
কোকিল কাকলী    কাল কল কুজিত

ললিত ললিত নিকুঞ্জে॥
কেতকী চম্পক কদম্ব স্তবক
বকুল নকুল রঙ্গে।
হেরইতে মধুর মধুপানে মধুকর
মালিনী মন বিভঙ্গে॥

'লোর চন্দ্রাণীর' কথা এই খানেই শেষ করিলাম। উক্ত রাজসভায় আলাওল নামক মুসলমান কবি কর্তৃক মাগন ঠাকুরের আদেশে, পদ্মাবতী সয়ফল মুল্লুক ও বদিয়ুজ্জামান, মহম্মদ খাঁর আদেশে সপ্ত পয়কর ইত্যাদি অনেক পুস্তক লেখেন। পূর্ব্বেই উল্লেক করিয়াছি কবি দৌলত কাজী 'লোরচন্দ্রানী' নামক পুস্তকের অর্দ্ধাংশ লেখেন। পুস্তক লিখিতে লিখিতে অসময়ে দৌলত কাজী কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়েন। আলাওল পরে ঐ পুস্তকের শেষাংশ লেখেন। আলাওলের রচনাও অত্যুৎকৃষ্ট। তাঁহার প্রণীত পদ্মাবতী ও একখানি সুন্দর পুস্তক। পদ্মাবতী পুস্তক প্রথম হিন্দু ভাষায় ১৫২০ খৃঃঅব্দে মালিক মহম্মদ রচনা করেন। আলাওল তাহা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করেন। আলাওল সপ্তদশ শতাব্দীতে ফতেয়াবাদ পরগণায় জালালপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আরকাণ আগমনের বিষয়ে একটী ঘটনা এইরূপ,—একদা তিনি পিতার সহিত সমুদ্র যাত্রা করেন। পথে পর্ত্তুগীজ জল দস্যুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েন। তাঁহার পিতা ঐ যুদ্ধে প্রাণ হারাণ। আলাওল কোন ক্রমে প্রাণ রক্ষা করিয়া আরকান রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। ঐ স্থানেই পদ্মাবতী পুস্তক লেখেন। ঐ কাব্যের স্থানে স্থানে এরূপ সুন্দর লেখা দৃষ্ট হয় যে, তাহার তুলনা বঙ্গ সাহিত্যে দুর্ল্লভ। একজন মুসলমান কবি, হিন্দুর আচার বিষয়ে যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা মুসলমানগণের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না। মুসলমানগণ বঙ্গ সাহিত্যে কতদূর দখলীকার হইয়াছিলেন পদ্মাবতী ও লোরচন্দ্রাণী তাহার একটী উজ্জ্বল কীর্ত্তি স্তম্ভ।

বঙ্গভাষায় মুসলমান লেখক কম হেন, সৈয়দ মর্ত্তুজা, আলিরাজা প্রভৃতি অনেকেই সুপরিচিত। তাই বলিতেছিলাম-আমাদের মাথার মণি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক যে ভাষা অনাদৃত অবস্থায়, আবর্জ্জনার গভীর কোণে পড়িয়াছিল; তাই মুসলমানগণ আদর করিয়া তাহার সমূহ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

তাহাই আজ শুভদিনে, বঙ্গভাষার ও বঙ্গজননীর উন্নতির দিনে, মুসলমান ভ্রাতৃগণকে যুক্ত করে নিবেদন করিতেছি, ভাই মুসলমানগণ! তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ প্রথমে ভারতে প্রবেশ করিয়াই এদেশের লোকের সাহার্য্যার্থে কতদূর অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, হিন্দুদের সহিত একযোগে দেশের কার্য্য করিয়াছেন। আর তোমরা আজ পাঁচশো বৎসর বাঙ্গলার দেশে বাস করিয়া, এক কথায় বঙ্গবাসী হইয়া এই শুভদিনে হিন্দুদের সহিত একযোগে দেশীয় ভাষার আরও উন্নতি করিতে পারিবেনা কি? আর ভাই হিন্দুগণ, যাহারা তোমাদের দেশে নূতন প্রবেশ করিয়া, তোমাদের সঙ্গে মিশিয়া মিশিয়া তোমাদের শিক্ষার পথ, দীনাবলভাষার পথ পরিষ্কার করিয়া যে সমূহ উপকার সাধন করিয়া দিয়াছেন, তোমরা কি তাহাদের বংশধরগণের নিকট অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞ রহিবে না?

শ্রীরাধা গোপাল মিত্র।

## বঙ্গে দুর্গোৎসব।

১

বরষা বিগত এবে শরৎ আইল।
মানবের দুঃখ কষ্ট সব দূরে গেল।
মেঘোন্মুক্ত নবশশী,
ছড়ায় কৌমুদী রাশি,
সাজিল প্রকৃতি দেবী মধুর সাজেতে।
মার আগমন পুনঃ জানাতে জগতে॥

২

কুমুদ কহ্লার আদি ফুটিয়া উঠিল।
গন্ধবহ সনে মিশে চৌদিকে ছুটিল॥
হরিত মাঠের শোভা,
বুভুক্ষের মনোলোভা,
ঘনঘন অন্ধকার সব দূরে গেল।
মার আগমনে সবে আনন্দে মাতিল।

৩

হরিতে মোদের দুঃখ সম্বৎসর পরে।
আসিছেন জগন্মাতা বাঙ্গালির ঘরে॥
ঘুচাতে মান[illegible]ভয়,
[illegible] বরাভয়
আসিয়াছেন দশ ভুজা অবনী মাঝারে।
খোলরে নয়ন মাকে রাখ হৃদি পরে॥

৪

উঠ ভাই বঙ্গবাসী ঘুমাওনা আর।
শোভা নাহি পায় আর ঘুমান তোমার॥
পূজিছে সবাই দেখ,
তুমি কেন শুয়ে থাক,
এত ঘুম তোমাদের কভু ভাল নয়।
কেন বৃথা ঘুমাইয়া আয়ু কর ক্ষয়॥

৫

আয়গো অভয়া আয় হৃদয় মন্দিরে।
পূজি তোর পাদুখানি বিমল অন্তরে।
কুপুত্র আমরা তোর,
তাই কি মা ঘুমঘোর,
ফেলেছ মোদের এবে আলস্য-সাগরে।
জাগ কুল কুণ্ডলিনী তোল করে ধরে॥

৬

পতিত পাবনী দেবী জননী যখন।
শীতলিবে পাপ তাপ অবশ্য তখন॥
কুপুত্র যদি চ হয়,
কুমাতা কখন নয়,
ভক্তি ডোরে বাঁধ আজি রাজীব চরণ।
দয়াময়ী মা মোদের ভাব কি কারণ॥

৭

স্বধর্ম্মে আচার ভ্রষ্ট হইব না আর,
অনাচারে এ জীবন করিব না ভার।
মোটা বস্ত্র মোটা ভাতে,
সন্তোষ লভিব চিতে,
আর ভুলিব না তব রাতুল চরণ।
এইরূপ মতি মাতঃ দেহগো এখন॥

৮

এস বঙ্গবাসী এস, এস সবে মিলে।
দিই এস পুষ্পাঞ্জলী চরণ কমলে॥
মন-জবা আন তুলে।
শুকতি চন্দন ঢেলে
পূজ মাকে, আর কিবা আছেরে সম্বল।
যা দিয়ে পূজিলে হবে জীবন সফল॥

৯

পেয়েছি যতেক দুঃখ জানত সকলি।
মাতৃ মন্ত্রে দীক্ষা যেন কভু নাহি ভুলি॥
এবার ভুলিলে আর,
নিস্তার নাহি কার,
এই ভিক্ষা মাগি মাতঃ চরণে তোমার।
বিস্মৃতি আসিয়া যেন নাহি, ধরে আর।

১০

তব নাম মহামন্ত্র সাধনা সবার।
যেন কভু নাহি ভুলি চরণ তোমার॥
এই ভিক্ষা মাগি মোরা
রেখো মা চরণে তারা
অধম সন্তানগণ হেরো গো জননী।
শরণাগতেরে রক্ষঃ পতিত পাবনী॥

শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঘোষ।

---

## আহুতি।

—:•:—

সমুখে অনল রাশি,
হাসিছে বিকট হাসি,
গভীর আঁধার আসি,
ঘিরিছে গভীর-স্তর,
নিরিবিলি নিরজন,
নীরব গহন বন,
মাঝে মাঝে সমীরণ,
কাঁপিতেছে থর থর ;
আকাশ এসেছে নামি,
কোলাহল গেছে থামি,
আমারে এবার আমি
করিব আহুতি দান,
গেছে সুখ সহি দুঃখ
কিসে রব জাগরুক
গেছে হাসি অশ্রুটুক
তাও বুঝি হয় ম্লান।
দীপ যথা একে একে
তৈল বিন্দু গায়ে মেখে
শেষে নিজ শিখা মুখে
আপনি মিশিয়া যায়,
তেমতি এ সাধ আশ
হলে যদি ভস্ম রাশ,
অন্তিমের নিশোয়াস
মিশুক নিশ্বাস বায়।
এই আঁধারের ভার
সহিতে নারিব আর
বজ্রানলে চপলার
হাসিটী যেমনি মরে,
কঠোর চিন্তায় ছুটি
আমিও আসিব ছুটি
হে অনল শিখা! উঠি
লওনা করুনা করে।
আপন নয়ন জলে
মেঘ যথা যায় গলে
আপনার পদ তলে
লুটায় আপন কায় ;
বিধি ভত অশ্রু দিয়ে
গড়িও পাষাণ হিয়ে
এ দীর্ঘ জীবন নিয়ে
লুকাতেম আপনায়।
নদী যথা ধীরে ধীরে
মিশেগো সাগর নীরে
ভুলিয়া সীমা ও তীরে
আসিতেছে হয়ে ক্ষীণ,
কল্ কল্ চল্ চল্
প্রাণের তটিনী জল
সুধানীরে সুশীতল
ডুবিবে এ দীনহীন।

শেষ করে নিজ কাজে
তপন যেমন সাজে
আপন অনল মাঝে
নিভায় অনল তার,
তেমতি তেমতি আমি
হে পরাণ, ওগো স্বামি,
জীবন যজ্ঞেতে নামি
হইবগো ছারখার
ধুম উদ্গীরিল ব্যোমে
যাতনার যজ্ঞ হোমে
জলে উঠে প্রতিরোমে
হৃদয়ের অনল রাশ,
(যথা) আগ্নের পর্ব্বত জলে
আপন হৃদয়ানলে
তেমতি করিয়া পলে
হয়ে যাব ছাই পাঁশ।

শ্রীবীরেন্দ্র লাল চৌধুরী।

---

# মিরণ্ডা ও কপালকুণ্ডলা।

—:•:—

মিরণ্ডা ও কপালকুণ্ডলার চরিত্রের মূল উপাদান প্রেম। একের সেই অনাবিল প্রেম রাশি হৃদয়ের ভাবগুলিকে শিশির স্নাত করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া মর্ত্ত্যলোকে ছড়াইয়া দিয়াছে, যে মর্ত্ত্যলোক ঘোর অবর্ণীদের কলহ বিবাদ, স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ ও কুটিলতায় জর্জ্জরিত, সেই মর্ত্ত্যলোকও যেন সেই স্বাস্থ্যকর প্রেম সলিলে অবগাহন করিয়া কত সুখের মনোমোহন ছবি নয়নের সাম্নে ধরিতেছে, বিভ্রান্তি জন্মাইতেছে যে এ সংসার নারকীদের আবাস স্থল নহে, এ স্থানেও দেব দেবীরা অবতীর্ণ হইয়া সময় সময় জীবের দুঃখ ভার লাঘব করিয়া থাকেন।

অপরের সেই বিশুদ্ধ প্রেম নশ্বর ভোগ ও বাসনার অতীত অবস্থায় পহুছিয়া বলিতেছে, তোমরা তোমাদের সমাজে যে সব লোক দেখিতেছ, উহাদের-হৃদয় সমাজের হলাহলে বিভীষিকা পূর্ণ, মনুষ্যের স্বাধীনতাই প্রকৃতি, সমাজের বিষে দেব প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া ফেলে। মিরণ্ডার কবি সৌন্দর্য্য তরঙ্গ-সন্নিভ মিরণ্ডাকে সংসার জ্ঞানাভিজ্ঞা করিয়া সংসারবাসীর আশাস্থল হইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কপাল কুণ্ডলার কবি অদ্ভুতপূর্ব্ব চরিত্র আঁকিয়া আমাদিগকে প্রকারান্তরে বলিতেছেন,—শিক্ষা দ্বারা হৃদয়ের কোমলবৃত্তি গুলির উন্মেষ হয় বটে, কিন্তু যে স্থলে হৃদয়ের স্বাধীনতা শিক্ষাপ্রভাবে ও সমাজের ঘাত প্রতিঘাতে বিনষ্ট হয়, সে স্থলে মানব চরিত্রে প্রকৃতির সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বুঝা যায় না। প্রকৃতির ইঙ্গিত যে চরিত্রে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত না হয়, সে চরিত্র Natural বা স্বাভাবিক নহে। অসীম প্রকৃতির অবিকৃত সৌন্দর্য্য যাহার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে নাই, সে সমাজের কোন না কোন উপকারে আসিতে পারে, সে উপকারের মধ্যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ সম্বন্ধ রহিয়াছে, সমাজ বন্ধনের জন্য যে স্বার্থ সূত্র, আমাদিগকে পরস্পরের সহিত পরস্পরকে বেড়িয়া রাখিতেছে, ক্রমশঃ সেই স্বার্থ সূত্র ছিন্ন করিয়া স্বাধীন প্রকৃতির কোলে স্বাধীনভাবে স্বাধীন মান

যত্নে রাখিয়া দিয়া তাহার বৃত্তিগুলি ঈশ্বরোন্মুখ করিতে পারিলে মনুষ্য সেই অবস্থায় যে সুন্দর চরিত্র লাভ করে, সেই চরিত্র খাঁটি বা Natural কপাল কুণ্ডলার কবি তাই খাঁটী চরিত্র আঁকিয়া আমাদিগকে দেখাইবার জন্য সমাজ ছাড়িয়া অরণ্যের নিভৃত প্রদেশে প্রকৃতির সুচারু হস্তে কপালকুণ্ডলাকে প্রতিপালনের জন্য অর্পণ করিলেন। এবং শৈব কাপালিকের সাহচর্য্যে তাঁহার কেমন হৃদয় খানি ভগবৎ প্রেমস্রোতে ভাসাইয়া দিলেন, ভগবৎ প্রেম মুগ্ধা প্রকৃতি-পালিতা রমণী; সমাজ-নিয়ম-বিধ্বস্তা, স্বাধীন ভাব বর্জ্জিতা স্ত্রীলোক অপেক্ষা কতদূর অবিকৃত সুন্দর ও স্বাভাবিক, তাহাই কপালকুণ্ডলার চরিত্রে বিবৃত হইয়াছে।

প্রেম মানব জীবনের নিয়ন্তা, প্রেমই লোকের হৃদয় উচ্চ করে, স্বার্থ আগে বিনষ্ট করায়, সকলকে আত্মবৎ ভাবিতে শিক্ষা দেয়, পরের আশ্রয় স্বরূপ হইতে অভিলাষ জন্মায়। প্রকৃতির হৃদয়ে কুটিলতা ও স্বার্থপরতা নাই প্রকৃতি ভাণ জানে না, প্রকৃতির যেখানে যাহা অভিনয় হয় তাহা অবিকৃত, প্রকৃতির হৃদয় প্রেম সাগর, ইহা সর্ব্বদাই মহত্বের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, এ সাগর জোয়ারের বেগে স্ফীত হয় না, ভাঁটায় শুকাইয়া যায় না, প্রকৃতি চির প্রেমময়ী। কাজেই প্রকৃতির অংশ যে চরিত্রে অধিক সম্ভোগ করিতে পারে, সেই চরিত্রই অধিক প্রেম সম্পন্না, উদার ও অবিকৃত। প্রেম অনেকটা যৌলিক, কিন্তু উহা শিক্ষা দ্বারা মার্জ্জিত হয়, মিরণ্ডায়ও এইপ্রেম অনেকটা উৎকৃষ্ট শিক্ষার ফলে ও স্বভাবের সাহায্যে মার্জ্জিত হইয়াছিল, কপাল কুণ্ডলার শিক্ষা দাত্রী সর্ব্বাশ্রয়ভূতা প্রকৃতি, অজ্ঞানী কাপালিকের অধীনে থাকিয়া কপাল কুণ্ডলা ভবানীকে ভক্তি করার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু কিরূপে ভবানীকে ভক্তি করিলে ভবানীর প্রসাদ লাভ করা যায়, তাহার শিক্ষার ভার প্রকৃতির উপর সংন্যস্ত ছিল, এখন দেখা যাইবে মনুষ্যের শিক্ষায় মানব চরিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়, না প্রকৃতির শিক্ষায় মানব চরিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়।

মিরণ্ডা মিলনের ডিউকের কন্যা। তাহার পিতার নাম প্রসপীরো। আণ্টনিও নেপলস রাজার সঙ্গে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া জ্ঞানানন্দ প্রসপীরোকে একখানি জীর্ণ তরণিতে ভরিয়া সমুদ্র মধ্যে ভাসাইয়া দিলেন, প্রসপীরো মিরণ্ডাকে লইয়া ভাসিতে ভাসিতে একটি দ্বীপের উপর আসিয়া ঠেকিলেন, এই নির্জ্জন দ্বীপে প্রসপীরো মিরণ্ডাকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন, মিরণ্ডা Ariel রক্ষিতা দ্বিপবাসিনী।

কপাল কুণ্ডলা এক ব্রাহ্মণের কন্যা, বাল্য কালে এক দুশ্চরিত্র খ্রীষ্টিয়ান কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া পরিশেষে ভীষণ সমুদ্র তীরে নিক্ষিপ্ত হয়। উভয়েই মনুষ্য সমাজের দূরে বাল্যকাল হইতেই অবস্থিতা, উভয়েই বাল্যকাল হইতে নির্জ্জন প্রদেশে, প্রকৃতির প্রশান্ত ক্রোড় সাগরতীরে পরিপুষ্টা, একই রকম প্রদেশে উহাদের গৃহ-প্রতিষ্ঠা, এইজন্য দেখা যায়; যেন উহাদের জীবনেরও খানিকটা গতি একই উদ্দেশ্যে প্রবাহিত।

মিরণ্ডায় কবি মিরণ্ডার প্রেমস্ফুরণ করিতে

গিয়া একটি ঘটনার সৃষ্টি করিলেন, ঘটনাটি এই।—প্রেমময়ী মিরণ্ডা দ্বীপের উপকূলদেশে থাকিয়া দৃষ্টি করিলেন, সাগরের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গ ভৈরব নিনাদে ছুটিতেছে, আকাশে মেঘ এত ঘনীভূত হইয়াছে যে মিরণ্ডার বোধ হইল যেন উহা হইতে অনন্ত অঙ্গার পাত হইবে, তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণ সাগর যেন সেই অনন্ত অঙ্গার নিভাইবার জন্যই উথলিয়া উঠিয়াছে, এই তরঙ্গ রাশির উপর একখানি তরণি দেখিয়া মিরণ্ডা মায়া বিদ্যাবিশারদ পিতা প্রসপীরোকে সকাতরে বলিতে লাগিলেন,—

O, I have suffer'd
With those that I saw suffer : a brave vessel, who had, no doubt, some noble creatures in her, Dash'd all to pieces. O, the cry did knock Against my very heart. Poor souls, they perish'd. Had I been any god of power, I would Have sunk the sea within the earth or ere It should the good ship so have swallow'd and The fraughting souls withim her.

কপালকুণ্ডলায় কবি কপাল কুণ্ডলার প্রেম চিত্র দেখাইবার জন্য যে কৌশলটি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও বিস্ময় কর। তন্ত্রসাধক দুরাশয় কাপালিক ভৈরবীর প্রসাদাকাঙ্খায় নব কুমারকে যথার্থ লতা দ্বারা বন্ধন করিয়া বধের প্রাক্কালিক কার্য্য সমাধা করিতেছেন, নরবধে ভবানীর তুষ্টি হইবে ভাবিয়া কপাল কুণ্ডলা সে স্থান হইতে শাণিত খড়্গ অপসারিত করিলেন, কাপালিক যথার্থ খড়্গা অন্বেষণ করিতে গেলে, সত্বরা কপালকুণ্ডলা নবকুমারের বন্ধন রজ্জু ছিন্ন করিয়া বলিলেন, "পলায়ন কর আমার পশ্চাৎ আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি।" উভয় কবির কৌশলই বিস্ময়কর, তবে সেক্সপীয়রের কৌশলটি একটু মার্জ্জিত, তাহার কারণও নির্দ্দেশ করা কঠিন নহে। সেক্সপীয়র সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন, দৃশ্যাবলীর ভিতর দিয়া চরিত্র বিকাশ করাই তাহার মোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল, এ উদ্দেশ্য প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহা দ্বারা সুসংরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষার তারতম্যানুসারে ভবিষ্যৎ ফল প্রদর্শন করিবার দুইটি হেতু এই—ঘটনাতেই সমুত্থিত হইল।

মিরণ্ডা ইতঃপূর্ব্বে কোনদিন মনুষ্য মুখ সন্দর্শন করিয়াছেন কিনা চিন্তা করিতে পারিলেন না। ফার্ডিনাণ্ড তাহার পিতার সম্মুখে আনিত হইলে মিরাণ্ডা তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুগ্ধার ন্যায় বলিলেনঃ—

I might call him a thing divine, for nothing natural I ever saw so noble.

এই শুভ দর্শন হইতেই ফার্ডিনাণ্ডের প্রতি মিরণ্ডার অনুরাগ সঞ্চার হইল, মিরণ্ডার প্রত্যয় জন্মিল ফার্ডিনাণ্ড অপেক্ষা সুপুরুষ এজগতে দুর্লভ। মিরণ্ডা সুশিক্ষিতা রমণী, সমাজের বহির্ভাগে বাস করিলেও শিক্ষা প্রভাবে সমাজের চিত্র তাহার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত ছিল, সমাজ বন্ধনের মূল পুরুষ জাতি, ফার্ডিনাণ্ড যেমন তেমন পুরুষ নহেন, তিনি সুপুরুষ, কাজেই

মিরন্দা তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। মুগ্ধ না হইবেন কেন, যে সর্বাঙ্গ চিত্রের শিল্পী পুরুষজাতি, সে শিল্পীদের বিষয় এতকাল তাহার অন্তরান্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন সেই শিল্পী ঘটনা ক্রমে লোচনের সম্মুখে পাইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। মহাকবি এই ঘটনাটী দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন, সমাজের বহির্ভাগে প্রকৃতির মনোহর প্রদেশে মিরণ্ডার বাসস্থান কল্পিত হইলেও, মিরণ্ডার শিক্ষা মিরণ্ডাকে সংসারের দিকে টানিতেছিল। এই নিমিত্ত মিরণ্ডা সংসারের কিছু কিছু জিনিষ ভালবাসিতে অভ্যস্ত হইতেছিলেন, সে ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা এতকাল পূর্ণ হয় নাই। যেই মুহূর্ত্তে আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের পাত্র সম্মুখে পাইলেন, সেই মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ের বদ্ধদ্বার ফার্ডিনণ্ডের সম্মুখে মুক্ত হইয়া পড়িল। এখন পরস্পর পরস্পরকে চিনিলেন, পরস্পর পরস্পরের প্রতি মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। মহাকবি এই ভালবাসার মনোহারিত্ব ও সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য উহার মধ্যস্থলে প্রসপীরোকে দাঁড় করাইলেন. প্রসপীরো মিরণ্ডার দুর্দ্দমনীয় প্রণয়ের প্রতিরোধক হইলেন। যেমন প্রতিকূল পবন ও বারিবেগে মাঝির তরণি সঞ্চালন শক্তি পরীক্ষিত হয়, যেমন বেগবান অশ্বের উল্লম্ফন শক্তি তাহার গতির প্রতিরোধীয় অবস্থায় পরীক্ষিত হয়, তেমনি প্রেমময়ী মধুরহাসিনী মিরণ্ডার প্রণয়বল প্রসপীরোর প্রতিরোধে স্ফুটতর হইল। যেমন মন্দাকিনীর খর প্রবাহে ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল, তেমনি বুঝি মিরণ্ডার প্রণয়স্রোতে প্রসপীরোর বিরুদ্ধ-শক্তি ভাসিয়া গেল। পাশ্চাত্য কবির এই কৌশলটি প্রণয়ী প্রণয়িণীর হৃদয়ের চিত্র সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত করিয়াছে। ফার্ডিনাণ্ড নিজের পরিচয় ও হুদেবের কথা বলার সময় মিরণ্ডার নিকট জানাইতে ছিলেন, যে তিনি নেপলসের ডিউকের তনয় প্রসপীরো এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ধমকাইয়া ফার্ডিনাণ্ডকে বলিলেন ;—

I fear you have done yourself some wrong a word.

প্রসপীরোর এই বাক্যে মিরণ্ডা বুঝিলেন যে তাহার পিতা ফার্ডিনাণ্ডকে কপটাচারী বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহার পিতার এ ধারণায় তাহার আশা প্রদীপ চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় মিরণ্ডা একটা উৎকট উদ্বেগ ও দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন, তিনি একেত এতকাল কোন সুপুরুষ দেখেন নাই, দ্বিতীয়তঃ এই ফার্ডিনাণ্ডই তাহার প্রাণের আরাধ্য। ইহাকেই তিনি সর্ব্ব প্রথম হৃদয় অর্পণ করিয়াছেন, তাহার পিতা ইহা বুঝিয়াও কেন ফার্ডিনাণ্ডকে নির্দ্দয় বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন? মিরণ্ডা এ মর্ম্মান্তিক কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কাতরভাবে বলিলেন,—

Why speaks my father so ungently? This is the third man, that evr I saw; the first that e'er I sigh'd for: pity move my father to be inclined to my way!

এ কথায়ও প্রসপীরোর চিত্ত আর্দ্রিভূত হইল না। প্রসপীরো রুক্ষস্বরে ফার্ডিনাণ্ডকে ধমকাইয়া বলিলেন—তুমি যে পরিচয় দিতেছ উহা মিথ্যা, আমার এই দ্বীপ অধিকার করার

যতই তুমি চররূপে আবির্ভূত হইয়াছ, ফার্ডিনাণ্ড মহাশয়ের দিব্য দিয়া বলিলেন—ইহা কখনই নহে। মিরণ্ডা তখন আর আবেগ সামলাইতে পারিলেন না। তাঁহার ফার্ডিনাণ্ডের প্রতি যে দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহা প্রসপীরোর নিকট বলিয়া ফেলিলেন, ফার্ডিনাণ্ডের প্রতি মিরণ্ডার এ ধারণা বড়ই সুন্দর, বড়ই ভাবোদ্দীপক, মিরণ্ডার জীবনের ইহাই মহত্ব সে ধারণা এই:—

There is nothing ill can dwell in such a temple If the ill spirit have so fair a house good things will strive to dwell with it. মহাকবি এই অমৃত-মধুর বাক্যটি দ্বারা মিরণ্ডার চরিত্রের কি সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত করিলেন প্রসপীরো জ্ঞানবান পুরুষ, তাহার বাক্য অবহেলা করিয়া মিরণ্ডা ফার্ডিনাণ্ডকে ভাল বাসিলে প্রসপীরোর জ্ঞান, প্রসপীরোর অভিজ্ঞতা সকলই উপেক্ষিত হয়, ইহাতে কি মিরণ্ডার প্রতিভাও খর্ব্ব হইয়া পড়ে, কবির বড়ই স্নেহের তনয়া মিরণ্ডা, মিরণ্ডার চরিত্র কোন অংশে খর্ব্ব হইয়া পড়ে ইহা কবির অভিপ্রেত নহে, অথচ মিরণ্ডা যাহা নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহা নির্দোষ ইহাও অধিকন্তু স্ত্রী-প্রকৃতি মিরণ্ডার মুখ দিয়া কবি এই ধারণাটির ভাব প্রকাশ করিলেন, মিরণ্ডার অভিজ্ঞতার কাছে প্রসপীরোর জ্ঞান আপত্তি চুর মার হইয়া গেল। মিরণ্ডা যে প্রণয়ে অন্ধ নহেন, ইহা দেখাইয়া মিরণ্ডার প্রতি পাঠক বর্গকে সজাগিত করিলেন। কবির এ অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইতে অভিলাষ জন্মে।

পতিতাপ্রস্ত ছিলেন, মিরণ্ডার এই সরল বাক্যই তাহা প্রমাণিত করিতে পারে। প্রসপীরোর কর্ত্তব্যতার, মিরণ্ডার কোমলতা, প্রসপীরোর ভর্ৎসনার মিরণ্ডার কাতরতা, প্রসপীরোর নিগ্রহে মিরণ্ডার আত্ম-সমর্পণ, প্রসপীরোর ঘৃণায় মিরণ্ডার উদারতা ও বুদ্ধি কেমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বুঝিয়া শেষ করা যায় না। ভাব-জগতের মুকুট রাজেশ্বর সেক্ষপীয়রের মিরণ্ডা চরিত্র তুলনে অমরাবতীর শোভা বিকাশ করিয়াছে, ফার্ডিনাণ্ডের উপর যখন মিরণ্ডার প্রণয় পরিপক্কতা লাভ করিল, তখন প্রেমিকা মিরণ্ডা পিতার ক্রোধ নিবারণের জন্য ফার্ডিনাণ্ডের সমস্ত অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তাহার উদ্ধারের জন্য বলিলেন:—

Sir, have pity I'll bo his surety.

ফার্ডিনাণ্ডের জন্য মিরণ্ডা এখন আত্ম বিসর্জনে কৃত সংকল্প হইলেন, যে সীমাতিক্রম করিতে পারিলে নিঃস্বার্থ ভালবাসার রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যায়, মিরণ্ডা সেই সীমাতিক্রম করিলেন। প্রসপীরো এখনও নিষ্ঠুরাচরণ পরিত্যাগ করিলেন না। মিরণ্ডা ফার্ডিনাণ্ডকে রূপবান মনে করিলেও প্রসপীরোর চক্ষে তিনি কদাকার বিবেচিত হইলেন, প্রসপীরো তাই কন্যাকে রাগ করিয়া বলিলেন:—

To the most of men this is a Caliban And they to him are ange's,

পিতার এই বিদ্রূপে মিরণ্ডা ব্যথিত হইলেন ফার্ডিনাণ্ডকে তিনি মহাসুন্দর বলিলেও তাঁহার ...ক সুন্দর বলিয়া প্রশংসা করিবেন

না। মিরণ্ডা জানিতেন ফার্ডিনাণ্ডের নিকট একজন তুলনায় সুন্দর বর নাই। তাঁহার পিতা হয়ত তাঁহার পছন্দানুযায়ী সুপুরুষ খুঁজিবেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কি? তখন তিনি প্রত্যুত্তর করিলেনঃ—

My affections Are then most humble, I have no Ambition to see a godlier man.

মহাকবি এই বাক্যটি দ্বারা বুঝাইলেন যে মিরণ্ডা খাঁটি প্রেমিকা। তাঁহার এ প্রেমে চাঞ্চল্য নাই। ফার্ডিনাণ্ডের প্রতি মিরণ্ডার ভালবাসার মূলদেশ বাপী-মধ্যস্থ পঙ্কজিনীর ন্যায় আবদ্ধ। মিরণ্ডা সান্ত্বনা প্রদানেই বা কতদূর সুদক্ষা। ফার্ডিনাণ্ড যখন প্রসপীরোর উৎপীড়নে কারাগারে উৎপীড়িত হইয়া মিরণ্ডার দর্শন-সুখই আশাই জনক ও বন্ধুবর্গের শোক সম্বরণের উপায় মনে করিলেন, কিন্তু তাঁহার দর্শন পাইবেন কিনা সেই সন্দেহে পীড়িত হইতেছিলেন, তখন মিরণ্ডা তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেনঃ—

My father's of a better nature, Sir- Than he appears by speech, this is unwont'd which now Came from him.

এতক্ষণ প্রসপীরো কেবল কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করিয়া মিরণ্ডার ভালবাসার পরিমাণ করিয়াছেন, ঐ উপরে মিরণ্ডার হৃদয়খানি যতটুকু খুলিয়াছে, তাহাই আশ্চর্য্য জনক। কিন্তু মহাকবি ভালবাসার অসাধারণ ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাই আমাদিগকে আরও স্তম্ভিত করার জন্য পরেও মিরণ্ডার হৃদয় দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

ফার্ডিনাণ্ড গুহার সম্মুখে প্রসপীরোর আদেশে কাষ্ঠ বহন কার্য্যে নিয়োজিত। তিনি নেপলের ডিউকের পুত্র, এ কার্য্য তাঁহার কতদূর কষ্টকর তাহা সহজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। ফার্ডিনাণ্ড যখন পরিশ্রান্ত তখন ধীরে ধীরে একটি সহৃদয়া বালিকা তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। বল ত পাঠক, ফার্ডিনাণ্ডের এ গভীর দুঃখ জনক কার্য্যে কাহার কারুণ্য ফুটবে? মিরণ্ডার পিতা মিরণ্ডাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, মিরণ্ডা যেন ফার্ডিনাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে, কাষ্ঠ-বহন-কার্য্যে-নিয়োজিত ফার্ডিনাণ্ড, তাঁহার দুঃখে ক্লিষ্টা প্রেমিকা মিরণ্ডা সম্মুখে। ফার্ডিনাণ্ড ও মিরণ্ডা এখন দুইজন নহে। উঁহাদের হৃদয় মিলিয়া গিয়াছে, তাই ত দুঃখিনী মিরণ্ডা ফার্ডিনাণ্ডের দুঃখে দুঃখানুভব করিয়া পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও আসিতে পারিয়াছেন। এই অবস্থায় ফার্ডিনাণ্ডের সম্মুখে মিরণ্ডাকে দেখিলেই মিরণ্ডা কতদূর ফার্ডিনাণ্ডকে ভালবাসিতেন তাহা নিরূপিত হইতে পারে। এখন আর মহাকবি অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতে বলিলেন না। ফার্ডিনাণ্ডের উপাসনায় মিরণ্ডা কতদূর অগ্রবর্ত্তিনী তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়া আমাদিগকে রোমাঞ্চিত করিলেন, মিরণ্ডা ও ফার্ডিনাণ্ড এ সময় যে কথা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ঃ—

Mir. Alas, now, pray you, Work not so hard. I would the lightning had

join'd to pile, pray, set it down and rest you: When this burns 'Twill weep for having wearied you, my father Is hard at study, pray now, rest yourself. He's safe for those three hours.

Fer. O most dear mistress,
The sun will set before I shall discharge
What I must strive to do.

Mir. If you'll sit down.
I'll bear your logs the while, pray give me that;
I'll Carry it to the pile.

Fer. No precious creature;
I had rather crack my sinews. break my back,
Than you should such dishonour undergo
While I sit lazy by.

Mir. It would become me
As well as it does you, and I should do it
With much more ease, for my good will to it
And yours it is against.

মিরণ্ডা ফার্ডিনাণ্ডের কষ্টে ক্লিষ্ট. সে কষ্টের ভার নিজের স্কন্ধে বহন করিয়া, তাঁহাকে ক্লেশমুক্ত করিতে প্রস্তুত, ফার্ডিনাণ্ড তাহাতে স্বীকৃত নহেন। কোমলাঙ্গী মিরণ্ডা কঠোর কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন, আর তিনি পুরুষ হইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন! মিরণ্ডা তথাপিও নিরাশ না হইয়া কার্য্যোদ্ধারের জন্য অনেক কথা পাড়িলেন, অবশেষে বুঝিলেন-ফার্ডিনাণ্ডও তৎপ্রতি বিশেষ আসক্ত। তখন মিরণ্ডার হৃদয় আরও খুলিয়া গেল। তিনি প্রেমের কথা আর গোপন করিতে পারিলেন না, যত গোপন করিতে চেষ্টা করেন, ততই ব্যাকুল হইয়া পড়ে, অবশেষে লজ্জা সরম পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন:—

"I am your wife, if you will marry me; If not I'll die your maid; to be your fellow, you may deny me, but I'll be your servant whether you will or no."

মিরণ্ডার প্রেমে ফার্ডিনাণ্ড আত্মহারা, মুগ্ধ। ফার্ডিনাণ্ড মিরণ্ডাকে পত্নী রূপে প্রতিগ্রহণ না করিলে সামান্য পরিচারিকার বেশে থাকিয়াও মিরণ্ডা তাঁহাকে ভালবাসিতে প্রস্তুত। মিরণ্ডার ভালবাসা এত প্রবল যে [illegible] মানুষের পত্নী হইবার যথেষ্ট দাবী [illegible] রে। সেই দাবী যদি ভালবাসার [illegible] অন্তরায় হয়, তাহা হইলে মিরণ্ডা ভালবাসা প্রয়োজন হইলে দাসীর পদে বরণ করিতেও কুণ্ঠিতা নহে। দেখিলেন পাঠক! মিরণ্ডার প্রেমের উদ্দাম কেমন, কুরিয়া মিরণ্ডার অভিমানকে পরাস্ত করিল, মনে হয় এরূপ প্রণয় দুঃখ-জ্বালা পূর্ণ সংসারে শান্তির উৎস, মিরণ্ডার মহানুভবতা, মিরণ্ডার সুমিষ্ট বিনয় নম্র সম্ভাষণ, মিরণ্ডার স্বার্থত্যাগ ও আত্ম বিসর্জ্জন, মিরণ্ডার ভালবাসা লাভের জন্য মনের ঐকান্তিক উৎকণ্ঠা, বড়ই ভাব পূর্ণ, বড়ই বিস্ময়কর। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় মিরণ্ডার প্রেম পরিপূর্ণ হৃদয় খানি সতত উদার, উহাতে প্রণয়ের সংকীর্ণতা বা শুষ্কতা ছিলনা।

এখন একবার কপালকুণ্ডলার বিষয় আলোচনা করি। মিরণ্ডা যেমন ফার্দিনাণ্ডকে দেখিবাই ভুলিয়া গেলেন, যেহেতু একটী পুরুষ সহেচ্ছার বীজ শিক্ষা প্রভাবে মিরণ্ডার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে দেখিয়া সেরূপ মোহিত হইলেন না। কারণ সংসার বন্ধনের মূল যে প্রণয় তাহা তাহার মধ্যে ছিলনা। কপালকুণ্ডলা সংসারের অভিধান কিছুই জানিতেন না। প্রকৃতি তাহার শিক্ষা দাত্রী। বন, ফুল লতা, পাতা সাগর, নদ, নদী, তাহার ভালবাসার পাত্র হইয়াছিল। কবি ইহা দ্বারা দেখাইলেন যে ভালবাসা একটি বৃত্তি, উহা যে কেবল ব্যক্তি বিশেষের উপর প্রযুক্ত হইয়া উৎকর্ষতা লাভ করিবে, তাহা নহে। উহার ক্রিয়া সমস্ত পদার্থের উপরই প্রকাশ হইতে পারে। মিরণ্ডা ফার্দিনাণ্ডের সহিত বিবাহে আবদ্ধ হইবার জন্য ব্যস্ত, কপালকুণ্ডলা বিবাহের নাম শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেনঃ—

বিবাহ !

আবার যখন কপালকুণ্ডলা শিবিকারোহণে সপ্ত গ্রামাভিমুখে যাইতে ছিলেন, মতিবিবি প্রদত্ত অলঙ্কার তাহার সম্মুখে ছিল, এক ভিক্ষুক তাহার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিলে কপাল কুণ্ডলা ও ভিক্ষুকের মধ্যে যে কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত হইল :—

কপালকুণ্ডলা।—আমারত কিছুই নাই, তোমাকে কি দিব? ভিক্ষুক কপালকুণ্ডলার কাঁধে যে দুইখানি অলঙ্কার ছিল তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, সে কি মা! তোমার গায়ে হীরা মুক্তা—তোমার কিছুই নাই?

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন—গহনা পাইলে সন্তুষ্ট হও?

ভিক্ষুক কিছু বিস্মিত হইল। ভিক্ষুকের আশা অপরিমিত, ক্ষণ মাত্র পরে কহিল, হইব-বই কি? কপালকুণ্ডলা অকপট হৃদয়ে কৌটা সমেত সকল গহনা গুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন। অঙ্গেরও অলঙ্কার খুলিয়া দিলেন।

কোন কবির চিত্রে এমন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিয়াছ কি? এরূপ চরিত্র চিন্তা করিলে মন স্বতঃই আনন্দে পরিপ্লুত হয়।

মনুষ্য সমাজই মানবকে লাভ লোকসানের চিন্তায় উচ্ছৃঙ্খল করে। কিসে দশজনের চেয়ে যশস্বী হইব, কিসে সুখ হইবে, কিসে লোকে আদর করিবে, এই যে একটী দুর্নিবার্য্য আকাঙ্ক্ষা আমাদের সমাজ আমাদিগকে পোষণ করিতে শিক্ষা দেয়। কারণ যাহারা এই সব আকাঙ্ক্ষা কথঞ্চিৎও পরিপূরণ করিতে পারেন, তাঁহারা সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। কপালকুণ্ডলা কাননবাসিনী, সেখানে লোক জনের তীব্র বিষয়-বাসনা-মদিরা নাই, সমাজের কুনিয়ম বিষে সে স্থান বিষাক্ত নহে, কাজেই সোণা, রূপা, হীরা, মাণিক্য যে একটা মূল্যবান জিনিষ, একটা সৌন্দর্য্যের আভরণ, ধনীর নিদর্শন, তাহা তাহার হিসাবে ছিলনা। বলত পাঠক! কোন জ্ঞান স্বাভাবিক? তৃণ লতা গুল্মাদি অপেক্ষা সোণা রূপা যে মূল্যবান, ইহা কাহার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তোমাদের দ্বারা নয় কি? তোমরাই যদি এখন ইচ্ছা কর

উহার সুখ হ্রাস করিত, তাহা হইলে তাহাও ত পারে। যে ভাব পরিবর্ত্তনীয় সে ভাব স্বাভাবিক নহে। উহা ভাবের বিকৃত অবস্থা মাত্র। কপালকুণ্ডলা অপরিবর্ত্তনীয়, প্রকৃতির নিকট হইতে অযাচিত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাই আমরা আমাদের ভোগ পরিপূরণের জন্য যাহা সুখকর, সুন্দর বা প্রয়োজনীয় বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি, তাহা তাঁহার নিকট বেশী সুখকর, সুন্দর বা প্রয়োজনীয় বোধ হইত না। এই জন্যই তিনি অকপট চিত্তে ভিক্ষুকের সমস্ত মূল্যবান অলঙ্কার অর্পণ করিতে পারিলেন; এই জন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন, "আজ বুঝিলাম, গজদন্তের যেন দুরেতি দোলা হলেম। চুল বাঁধিলাম, ভাল কাপড় পরিলাম, খোঁপায় ফুল দিলাম, কাঁকালে চন্দ্রহার পরিলাম, কানে ফুল দুলিল, চন্দন কুঙ্কুম, চুয়া, পান, সোণার পুত্তলি পর্য্যন্ত হইল। মনের মত সকলি হইল। তাহা হইলেই বা সুখ কি?"

তবে কি কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে কোনরূপ সুখের আকাঙ্ক্ষা ছিলনা? ছিল বৈকি। প্রকৃতির দুহিতা প্রকৃতির নিকট হইতে যে সুখ দাবী করিতে পারে, কপালকুণ্ডলার সেই সুখের আদর্শ হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। কপালকুণ্ডলা বন্য জাতি, এইজন্য যে স্বাধীনতার বর্জ্জন করিয়া ক্ষুদ্র গৃহের অন্তঃপুরের কোণে আবদ্ধ থাকিতে হইবে, এরূপ বাধ্যবাধকতা তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি জানিতেন কার্য্য করিতে হইলে স্ত্রী জাতির পুরুষের ন্যায় স্বাধীন ভাবে কার্য্য করার অভিলাষ অন্যায় নহে।

স্বাধীন প্রকৃতির দুহিতা স্বাধীনতা উপাসনাই ভাল বাসিতেন, বিবাহে তাহার স্বাধীন প্রবৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে, সংবৃত্তির অনুশীলনে বাধা পাইবেন, এইজন্য কপালকুণ্ডলা বিবাহকে বিদায় দিয়া বলিলেন, যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।

কবি এই কথাটি দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে পরের উপকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সংবৃত্তিগুলির উন্মেষ করিয়া যে সুখলাভ করা যায়, তাহা আধুনিক কালের বিবাহ সুখাপেক্ষা উচ্চতর। কপালকুণ্ডলাকেই উচ্চতর সুখকরে পদার্পণ করাইয়াছিলেন, তাই সেই সুখ জ্ঞান করিয়া বিবাহ-সুখ দাবী করিলেন না। নিবৃত্তির যে স্থলে আকাঙ্ক্ষা, কপালকুণ্ডলার সেই স্থলে ত্যাগ।

নিবৃত্ত হয়, Tfarding এর ন্যায় পৃথিবীর সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে বলিতেন, ত্যাগেতেই তাহার সুখের উৎস ছিল, কিন্তু কপালকুণ্ডলা কেবলমাত্র নবকুমারের সুখের জন্য পৃথিবীর অপর লোকের সুখের পথে কাঁটা দিতে পারিতেন না, বিবাহে স্ত্রী জাতির যে পতিই সর্ব্বস্ব বিবেচিত হয়, কপালকুণ্ডলার পতি তাহার নিকট সেরূপ বিবেচিত হইল না; পতি ও অপর লোক তুল্য বোধ হইল। অপরের উপকার করিতে গেলে যদি উহা নবকুমারের প্রেম জীবনে প্রতিকূল হইত, তাহা হইলে তিনিও অনেক দুঃখিত হইতেন, অধিকন্তু পরোপকার

প্রবৃত্তি তাঁহার এত প্রবলা যে স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি পরোপকার হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। শ্যামাসুন্দরীর ঔষধ তুলিবার জন্য যখন কপালকুণ্ডলা প্রতিশ্রুত হইলেন, নবকুমার বাধা দিয়া বলিলেনঃ—

"কাজ কি তোমার ঔষধ তল্লাসে? আমাকে গাছের নাম বলিয়া দাও। আমি ঔষধ তুলিয়া আনিয়া দিব।

কপাল। আমি গাছ দেখিলে চিনিতে পারি, কিন্তু নাম জানি না। আর তুমি তুলিলে ফলিবে না। স্ত্রীলোকের এলোচুলে তুলিতে হয়। তুমি পরের উপকারে বিঘ্ন করিও না।

কপালকুণ্ডলার ন্যায় স্বাধীন প্রকৃতির স্ত্রীলোক [illegible] সমাজে আসিয়া কতদূর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে কোন [illegible] না করিবে! ইহা কেবল [illegible] আমরা সচ্চরিত্র ও সাধু নই বলিয়া সমাজ আমাদিগকে শাসন করিতেছেন। আমরা উৎকৃষ্ট হইলে কপালকুণ্ডলার ন্যায় রমণী এ সমাজে এতদূর যন্ত্রণাগ্রস্ত হইবেন কেন? নবকুমারই বা তাহার সদিচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন কেন? কপালকুণ্ডলার স্বার্থত্যাগ যোগিনীর স্বার্থ ত্যাগের ন্যায় যে এ সংসারে প্রণয় বন্ধনের বন্ধন মুক্ত করিতে না পারিয়াছে সে এরূপ কঠোর স্বার্থ ত্যাগের কল্পনাও করিতে পারে না। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে ভালবাসা, তাহা অতি প্রশংসার্হ, কিন্তু সেই ভালবাসার উদ্দেশ্য যদি কেবল মাত্র ঐন্দ্রিয়িক সুখের লালসা হয়, তাহা হইলে [illegible] কি [illegible]

থাকিতে পারে। নবকুমারের প্রতি কপালকুণ্ডলার [illegible] ঐন্দ্রিয়িক সুখ, দুঃখ, [illegible] কপালকুণ্ডলার নিকট সকল সমান হইয়া গিয়াছিল। [illegible] তাহার সুখের জন্য তাহাকে [illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible] কপালকুণ্ডলা [illegible] [illegible] তোমার [illegible] [illegible] ব্রহ্মচারিণীর [illegible] আমি ব্রহ্মচারিণী ছিলাম, আবার ব্রহ্মচারিণী হইব।"

[illegible] কপালকুণ্ডলার [illegible] ছিল না, [illegible] গম্ভীর [illegible] শ্যামাসুন্দরীর উপকার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া একাকিনী অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল, যে উপকারিতার [illegible] পথ ছাড়িয়া [illegible] করিতে চাহিল, তাহার [illegible] পূর্ব্বে যে ভালবাসার নাম ইন্দ্রিয় [illegible] তাহার [illegible] ত্যাগ।

আমরা সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে [illegible] দেখি উহার অপর এক নাম ইন্দ্রিয় লালসা [illegible] কপালকুণ্ডলার [illegible] [illegible] তাহার প্রকৃতির ভালবাসার [illegible] স্ত্রীলোকের [illegible] আবদ্ধ ছিল না। [illegible] ভালবাসার মাপ-কাঠি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না, তাহার ভালবাসা [illegible] কপালকুণ্ডলা [illegible] বিশ্বপ্রেমিকা। এই মায়া প্রাণ [illegible] বিশ্বপ্রেমিকা [illegible]

কুণ্ডলা যোগ পালনার্থ সমাজ নিয়মাবদ্ধ নবকুমারের হাতে পড়িয়া যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, সে যন্ত্রণা অতি ভয়াবহ, অতি নিদারুণ, অতি মর্ম্মঘাতী, কাপালিকের আদেশে নবকুমার যখন মৃন্ময়ীর হাত ধরিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন নবকুমারের হাত কাঁপিতেছিল, এই সময় মৃন্ময়ী ও নবকুমারের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

"মৃন্ময়ি! কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর, এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসী নও: একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।"

কপালকুণ্ডলা হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, তুমিত জিজ্ঞাসা কর নাই।

নবকুমার উন্মত্তের ন্যায় কহিলেন, চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব বল—মৃন্ময়ি বল—বল—বল, আমায় রাখ, গৃহে চল, কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "যাহা জিজ্ঞাসা করিবে, বলিব আজি যাহাকে দেখিয়াছ সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি। একথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।"

ইহার পর যে ঘটনা ঘটিল তাহা সকলেরই স্মরণ আছে, দুঃখিনী কপালকুণ্ডলা নদী প্রবাহে নিমজ্জিত হইলেন।

আমরা যেরূপ "মাটির পুতুল" মাটিতেই সংসারে ভোগ লালসা পরিতৃপ্ত করিয়াই সুখী হই: উক্তরূপ সংসারে পবিত্রতার সৌন্দর্য্যবর্জ্জিত রমণীও দুর্লভ। এই শ্রেণীর রমণী যে পতি ও অন্যান্য পরিবারের সুখবৃদ্ধির হেতু হয়, তাহা ফার্ডিন্যাণ্ড ও প্রণয়িনীর বাক্যে প্রমাণীত হইল ফার্ডিন্যাণ্ড যে কেবল সৌন্দর্য্যের লোভে মিরণ্ডাকে ভাল বাসিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি ভাল বাসিয়াছিলেন তাহার অনন্য সাধারণ গুণে, গুণে বিমোহিত হইয়াই তিনি বলিয়াছিলেন:—

Admired Miranda!, Indeed the top of admiration! Worth what's dearest to the world! Full many a lady I have eyed with best regard and many a time the harmony of their tongues hath into a bondage brought my too diligent ear; For several virtues Have I liked several women.. Never any with so full soul, but some defect in her Did quarrel with the noblest grace she owed And put it to the foil but you, O you, so perfect and so peerless, are created of every creature's best!

আবার যখন প্রণয়ীরো রাজা ... জীর্ণ তরণিতে নিরন্তা পরে অকূল সমুদ্রে ভাসমান হইয়াছিলেন তখন দেবী দুর্লভ কন্যার হাস্যানন দেখিয়া প্রণয়ীরো ভবিষ্যৎ আশঙ্কার ভার দূর করিতে পারিয়াছিলেন; সে কন্যা ... জীবন প্রাণে অসামান্য বল উত্তি

করিতে পারে, সে কন্যা বড় সাধারণ নহে, ইহা ভাবিয়া এবণীয়ো কন্যা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত করিলাম :—

O. a cherubin

Thou wast that did preserve me

then didst smile.

Infused with a fortitude from heaven when I have deck'd the sea with drops full salt under my burthen groan'd. Which raised in me An undergoing stomach, to bear up Against what should ensue.

ঐ,পী রমণী হৃদয়ও সচরাচর মনুষ্যাবাসে ফোটে না, যেখানে ফোটে, সেখানের সুগন্ধ শুধু সে স্থল কেন, ত্রিদিবও প্রফুল্ল করিতে পারে, যাহাদের হৃদয় সংসার জ্বালায় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, মিরণ্ডা তাহাদের সঞ্জীবনী ঔষধ স্বরূপ। কিন্তু কপালকুণ্ডলা কেবল নির্জীব রোগীর চিকিৎসক নহেন তিনি জীবন্ত লোকের নিকট সজীব মূর্ত্তি, নির্ব্বোধ নিন্দুক লোক তাহার ধারে অগ্রসর হইতে পারে না। তাহার তেজে লোক, বহ্নি মুখ প্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া ছারখার হয়। নবকুমার তাই তাহার তেজে পুড়িয়া ছারখার হইলেন। মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্রও যখন বুঝিলেন, এ স্বাধীন প্রকৃতির হস্তে গড়া অকলঙ্কিত চরিত্র মায়া-মোহ পাশ বিমুক্ত কপালকুণ্ডলা, সাধারণ গৃহস্থের ঘরে শোভা পায় না তখন তিনি গম্ভীর হৃদয়ে প্র-তাঁর আবার কপালকুণ্ডলাকে পবিত্র জলে বিসর্জ্জন করিলেন, যে শিক্ষা কপালকুণ্ডলার সে শিক্ষার প্রাপ্তি করে তাহার স্বাধীন মূর্ত্তি পড়িবে, তবে কপালকুণ্ডলার ন্যায় রমণী মায়া মোহ বিমুক্ত হইয়া সংবৃত্তি গুলির অনুশীলন করিতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে। আমি কপালকুণ্ডলার ন্যায় রমণীকে সৃষ্টি করিতে হইলে আমাদের যে শিক্ষা, যে দীক্ষা আবশ্যক তাহা আমাদের নাই। আমি কপালকুণ্ডলার ন্যায় রমণীর সৃষ্টি করিতে হইলে যে রূপ মানসিক শক্তির স্ফুরণ আবশ্যক তাহা আমাদের নাই, তাই বলিয়া কি আসল জিনিষ ছাড়িয়া চিরকালই নকল জিনিষের আদর করিব?

এখন এই দুইটি চরিত্রের কোনটি শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিবে? অনেকের ধারণা আছে, পাশ্চাত্য কবি অসাধারণ শিল্পী হইলেও, আদর্শ চরিত্র রচনা করিতে পারেন না। সে বিশ্বাসটি যে ভুল তাহা বোধ হয়, মিরণ্ডার চরিত্রে উজ্জ্বল ভাবে প্রমাণীত হইয়াছে। সমাজের আবরণ ছাড়িয়া দিয়া যদি মূলের দিকে দৃষ্টি করা যায় তাহা হইলে বুঝা যায় যে লক্ষ্য সকলের একই জিনিষের উপর কেন্দ্রীভূত।

আমাদের মতে উভয় চরিত্রই শ্রেষ্ঠ, উভয় চরিত্রই ভাবপূর্ণ, উভয় চরিত্রই কবির অসাধারণ কীর্ত্তি স্তম্ভ। তবে কপালকুণ্ডলার যে শিক্ষা, তাহাই অবিকৃত, স্বাভাবিক, ও লক্ষ্য পথের অনুকূল, কাব্যের উদ্দেশ্য যদি কেবল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি না হইয়া লক্ষ্য পথ নির্দ্ধারণ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে কাব্য জগতে কপালকুণ্ডলারই শীর্ষ স্থান। মিরণ্ডার যে ভ্রম শিক্ষার পরিণতি, কপালকুণ্ডলায় সেই শিক্ষার আরম্ভ। সহ সম্পাদক।

# দাদোজী কোণ্ডদেব।

(ঐতিহাসিক সন্দর্ভ)

পাঠক! অতীত যুগে যে অক্ষয় চিত্র কাল গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে, আজ আমরা সেই চিত্রের চিত্রকরকে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিবার বাসনা করিতেছি। যাহার গুণে একদিন হিন্দু বৈজয়ন্তী সগৌরবে মহারাষ্ট্র ভূমে পত্ পত শব্দে উড়িয়াছিল, যার ভয়ে একদিন মুসলমান পতাকা ছিন্ন হইয়া মুসলমান হৃদয় কম্পিত করিয়াছিল, যিনি মানব নাট্যশালায়—বীরের অংশে অভিনয় করিয়া যবনিকা ক্ষেপন করতঃ অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন—তিনি কে? গো-ব্রাহ্মণ-হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষক, মহাভাগ শিবাজী। সেই চিত্রের চিত্রকর সর্ব্ব-বিদ্যা-বিশারদ গভীর রাজনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-দাদোজী কোণ্ডদেব।

এখানে বলা আবশ্যক যে, দাদোজী ভিন্ন অনেক অতুল কর্ম্মা ব্যক্তি শিবাজীর সহচর হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমে শিবাজীকে কোণ্ডদেব মানুষের মত মানুষ না গড়িলে সকলই বিফল হইত, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। দাদোজী কোণ্ডদেবের অমূল্য উপদেশ নবীন যুবক শিবাজী হৃদয়ে কিরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা যথা স্থানে উল্লেখ করিব।

১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দাদোজী কোণ্ডদেব পুনা প্রদেশের অন্তঃপাতী শিরোরের নিকট মলটন নামক পার্ব্বত্যপল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে অতি ধীর, সুশীল, শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট বালক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রখর বুদ্ধি এত দূর তীক্ষ ছিল যে, তিনি যে কথা শিক্ষকের নিকট একবার শুনিতেন, তাহা জীবনে কখনো বিস্মৃত হইতেন না।

তিনি কিশোর বয়সেই বেদ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ শিক্ষা করিয়া গ্রামের কুলকর্ণীর বা কার কুনের (হিসাব রক্ষক) কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই কার্য্য তাঁহারা পুরুষানুক্রমে করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা বলে সামান্য কর্ম্ম হইতে দক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ নিজামসাহী রাজ্যের প্রধান রাজস্ব সচিবের পদ লাভ করেন। এই রাজ্যে সাহজী নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়, সাহজী নিজামসাহী রাজ্যের একজন সেনাপতি। উভয়ে এক রাজ্যের এক দরবারের কর্ম্মচারী সুতরাং উভয়ে উভয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। সেনাপতি সাহজী লুখজী যাদব নামক একজন জায়গীরদারের পরমা সুন্দরী কন্যা জীজীবাইকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পারিবারিক দুর্ঘটনায় শ্বশুর জামাতায় মনের মিলন না হওয়ায় সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, ইহাতে সাহজী পরাজিত হইয়া পত্নী জীজীবাইকে পথিমধ্যে শ্বশুরের হস্তে ফেলিয়া পলায়ন করেন। জীজীবাই এই সময় গর্ভিনী ছিলেন। লুখজী যাদব প্রথমে স্বীয় সৈন্যগণ সহ তথায় গমন করেন কিন্তু কন্যার ভার লইতে অস্বীকৃত হন, পাছে সৈন্যগণ কন্যার প্রতি অসদ ব্যবহার করে, এই ভয়ে জীজীবাইকে বন্দিনী করিয়া সিউনারী দুর্গে অবরুদ্ধ করেন। সিউনারীদুর্গ পুনার ৫০ পঞ্চাশ মাইল উত্তরে অবস্থিত রহিয়াছে। *

* ইহার সংলগ্ন নগরের নাম যুন্নর, কেবল মাত্র দুর্গটী সিউনারী নামে অভিহিত হয়।

এই দুর্গেই ১৬,২৭ খ্রীষ্টাব্দে বন্দিনী অবস্থায় শিবাই দেবীর মন্দিরের নিকট জীজীবাইয়ের পুত্র ভূমিষ্ট হয়—ইনিই ভারত বিখ্যাত মহাবীর শিবাজী।

সে যাহা হউক নিজাম সাহী রাজ্যে শান্তি স্থাপন হইলে সাহজী বিজাপুর নবাবের মধ্যস্থতায় আপনার পূর্ব্ব জায়গীর, স্ত্রীপুত্র এবং ধন রত্নাদি পাইবার জন্ত দরবারে আবেদন করেন, সে সময় দরবারের কোন কর্ম্মচারী তাঁহার বিরুদ্ধতা না করায় তিনি স্ত্রীপুত্রাদি সহ সমস্ত ধন রত্নাদি পাইবার আদেশ পাইলেন।

তিনি জায়গীর পাইলেন, স্ত্রীপুত্র পাইলেন কিন্তু কে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণা করে, কারণ তিনি পরের চাকর, চাকুরি হইতে অবসর পাইবেন না। এই সব চিন্তায় তিনি অধীর হইলেন। অবশেষে বন্ধুবর বৃদ্ধ জ্ঞান গরিষ্ঠ দাদোজী কোণ্ডদেবের শরণাগত হইলেন এবং সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিলেন, দাদোজী সমস্ত বিষয় শুনিয়া জীজী বাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বালক শিবাজীর শিক্ষাদান ও জায়গীর রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

দাদোজী এই নূতন কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীজী বাই এবং শিবাজীকে দেখিতে আসিলেন। ইতি পূর্ব্বেই আদর্শ জননী, ধর্ম্মভীতা জীজীবাই দাদোজী কোণ্ডদেবের গুণের কথা শুনিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রণাম করতঃ পুত্র শিবাজীকে প্রণাম করিতে বলিলেন, পুত্র শিবাজীও প্রণাম করিল, দাদোজী উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, মা! আমি আজ হইতে তোমার রক্ষণাবেক্ষণের এবং বালক শিবাজীর শিক্ষকতার ও জায়গীর রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি। ব্রীড়াবনতা জীজীবাই স্বীয় কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন-যে আজ্ঞা ঠাকুর। তৎকালে মহারাষ্ট্র ভূমে দাদোজীর ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, ব্যবহার শাস্ত্র-বিদ এবং রাজস্ব বিষয়ক পণ্ডিত দ্বিতীয় ছিল না। তিনি যে একজন ধীশক্তি সম্পন্ন, কার্য্য তৎপর, ধর্ম্ম ভীরু ব্যক্তি সাহজী তাহা পূর্ব্ব হইতেই বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন; তাঁহাকে পূনা এবং সুপ, প্রভৃতি জায়গীরের ভার দিয়া তিনি নিশ্চন্ত হইলেন।

তিনি পূনায় আসিয়া দেখিলেন যে রাজ্যের প্রায় সমস্ত অংশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ, কৃষি ক্ষেত্রের একান্ত অভাব। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন, যে বন কাটিয়া জমী বাহির করিতে পারিবে, সে আমার ইচ্ছা মত কয়েক বৎসর বিনা করে চাষ আবাদ করিতে পারিবে। জন সাধারণ তাঁহাকে বিশ্বাস করিত, সেই জন্ত সকলে বন কাটিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য যে যাহাতে এই রাজ্য, লোক বহুল এবং উৎকৃষ্ট কৃষি কর্ম্মের স্থান হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় অত্যল্প কালের মধ্যে সমস্ত বন কাটিয়া মবলগণ পরিস্কার করিয়া ফেলিল, এই সমস্ত কার্য্য তিনি নিজেই ঘৃণিত মবল্যাগণ দ্বারা করাইলেন। সকলেই কয়েক বৎসর বিনা করে জমী চাষ আবাদ করিল। শেষে বৃদ্ধ দাদোজী কোণ্ডদেব সমস্ত জমী স্বয়ং দর্শন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ খাজনা ধার্য্য

করিয়া দিলেন, ইহাও সকলকে বলিয়া দিলেন যে, যদি তোমাদের জমীতে প্রচুর ফসল না হয় তাহা হইলে সমস্ত কর মাপ করিয়া দিবেন। অন্ন বস্ত্র হীন গরিব লোক সকল এইকথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইল। তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে চাষ করিতে লাগিল। হিংস্র পশু মারিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিয়া পশুহনন করাইতে লাগিলেন।

বহুদর্শী দাদোজী কোণ্ডদেবের বিচক্ষণতার এবং অমিত পরিশ্রমে অত্যল্পকাল মধ্যে রাজ্যের ৪০ হাজার টাকা আয় এবং হতভাগ্য মবলাগণের অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নত হইল। তাঁহার বড়ই অনুগত হইল। * তিনি তারপর বিচার বিষয়ে হাত দিলেন। তিনি দোষীকে কঠোর শাস্তি দিতেন কিন্তু তাহা পক্ষপাত শূন্য হওয়ায়, দোষী তাঁহাকে অভিশাপ দিত না। তিনি এরূপ কর্ত্তব্য পরায়ণ ছিলেন যে, একদিন স্বীয় অধীনস্থ কর্ম্মচারী বৃন্দ সহ বেড়াইতে যাইয়া কোন গৃহস্থের একটী পক্ক আম্র পাড়িয়া ফেলেন। তৎক্ষণাৎ কি কুকর্ম্ম করিলাম বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলেন-আমি-রাজার আদেশ ব্যতীত এবং গৃহস্থের বিনানুমতিতে এতগুলি কর্ম্মচারীর মধ্যে কি কুকাজ করিলাম। আমিই ইহাদের প্রধান কর্ম্মচারী, আমার আদর্শ ইহারা সকলেই গ্রহণ করিবে।

এই বলিয়া কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তরবারি দ্বারা দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিতে মনস্থ করেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা কাকুতি মিনতি করিয়া বলায় তিনি স্বীয় হস্ত কাটিলেন না বটে কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আজ হইতে এই ঘৃণিত হস্তে আর কোন আবরণ দিব না—তজ্জন্য তিনি একহস্ত বিশিষ্ট জামা ব্যবহার করিতেন।

সে যাহা হউক, তিনি রাজ্য শাসনের জন্য আইন কানুন, বিধি ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করিয়া একাকী সমস্ত কার্য্য করিতে অক্ষম হওয়ায় জায়গীর শাসনের জন্য সক্রোজী নীলকণ্ঠ, কৃষ্ণজী পন্ত হনুমন্ত, সোনপন্ত প্রভৃতি কয়েকজন ধর্ম্ম জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত করেন।

দাদোজী কোণ্ডদেব রাজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া শিবাজীর পাঠাভ্যাসের জন্য গুরুগিরিতে হাত দিলেন, অনিন্দ্য সুন্দর সুকুমার বালক শিবাজী, গুরু কোণ্ডদেবের নিকট—পুস্তক লইয়া প্রতিদিন হাজির হইতে লাগিলেন। কয়েক মাস অধ্যাপনার পর বহুদর্শী ব্রাহ্মণ দাদোজী কোণ্ডদেব দেখিলেন শিবাজীকে

* মবলাগণের বিষয় আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি, তাহার কারণ এই নিকৃষ্ট জাতিকে তখন সকলে ঘৃণা করিত। এক দাদোজীর চেষ্টায় এই জাতির চরম উন্নতি হইয়াছিল, যে জাতি এতদূর নিকৃষ্ট ছিল যে, সামান্য চাষ আবাদ করিতে পারিত না, উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে পড়িয়া উত্তরকালে এই পতিত জাতি রাজপুত ওণোচিত গুণে ভূষিত হইয়া শিবাজীর সহচররূপে মহারাষ্ট্রভূমে যে বীর কীর্ত্তির অভিনয় করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে। তাই বলিতেছিবে, কোন পতিত জাতিকে ঘৃণা করিতে নাই। পতিত জাতিও সময়ের গুণে উন্নত হয় লেখক।

পুস্তকের অক্ষর গণনা করিয়া পড়ান অপেক্ষা বীররসে দীক্ষিত করা শ্রেয়স্কর এবং পুস্তক পাঠেও শিবাজী তাদৃশ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াও আমি আশা করি না। তিনি দুই তিন দিন গভীর চিন্তার পর ঠিক করিলেন তাঁহাকে বীরের বীরত্ব কাহিনী পাঠ করাইবেন।

শিবাজী দুই তিন খানি পুস্তক পাঠ শেষ করিয়া দাদোজীর নুতন পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। বৃদ্ধ গুরু দাদোজী প্রথমেই রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি পুস্তকের বীরত্ব কাহিনী গুলি বাছিয়া তাহা পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সময়োপযোগী কার্য্য নির্দ্দেশ পূর্ব্বক শিবাজীর সবল-কোমল হৃদয়ে বীরত্বের বীজ বপন করিতে লাগিলেন। তিনি দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের অত্যাচার, সতীর সতীত্ব নাশ, মুসলমান কর্ত্তৃক গোব্রাহ্মণের দুর্গতি, দীনদুঃখীর শস্য নাশ, মুসলমান সৈন্যগণ দ্বারা দলিত ও মথিত, জন্মভূমির প্রতি অসম্মান প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা বর্ণনাএবং উহার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হওয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ দুর্ব্বল হৃদয়ে বলদান প্রভৃতি উদ্দীপক, উত্তেজনাময়ী বাক্যাবলী জ্বলন্ত ভাষায় তাঁহার নিকট বর্ণনা করিতে লাগিলেন, এই সকল শুনিয়া শিবাজী হৃদয়ে স্বদেশ প্রেমের প্রবল স্রোত বহিয়া যাইত। যখন দাদোজী অতীত দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করিতেন, তখন তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত ললাট বহিয়া স্বেদ বিন্দু এবং বৃদ্ধের বক্ষঃস্থল বহিয়া দর বিগলিত ধারে অশ্রু পড়িত। গুরুর ক্রন্দন দেখিয়া শিবাজীর চপল হৃদয় নাচিয়া নাচিয়া উঠিত, রোষে, ক্ষোভে সুন্দর মুখখানি রক্তিমাভা ধারণ করিত।

দাদোজী বালক শিবাজীকে শান্ত করিবার জন্য আবার রামায়ণের সীতার মিলন এবং মহাভারতের নলদময়ন্তীর পালা শুনাইয়া শান্ত করিতেন। শিবাজী, দাদোজী কোণ্ডদেবের অধীনে ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। গুরু যেমন অদ্ভুত কর্ম্মা ব্যক্তি শিবাজীও তদুপযুক্ত ছাত্র। গুরু দাদোজী কোণ্ডদেব কোন দিন বলিলেন,—শিষ্য। আজ এক ক্রোশ পথ দৌড়াইয়া আইস। শিবাজী তৎক্ষণাৎ দৌড়াইতে আরম্ভ করিতেন, আবার সময় মত আসিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত শিবাজী গুরুর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেন। গুরুর আজ্ঞায় শিবাজী কখনো অনাহারে অশ্বপৃষ্ঠে, কখনো হস্তীপৃষ্ঠে, কখনো গাছের শাখায়, কখনো বৃক্ষ হইতে লম্ফ দিয়া পড়িতেন আবার কখনো সূচী ভেদ্য নিবিড় বনাচ্ছাদিত পর্ব্বতোপরি ছুটাছুটি করিতেন।

শিবাজী গুরু কোণ্ডদেবের আজ্ঞায়, উঠিতেন বসিতেন। গুরু শিবাজীর আহারের সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন, সময় সময় গুরুর আজ্ঞায় অনাহারে কাল কাটাইতে হইত। শিবাজীকে এত শিক্ষা দিয়াও তাঁহার মন পরিতুষ্ট হইল না। ভগবান মহাদেব যেমন পরশুরামকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার বর দিয়া স্বয়ং স্বহস্তে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন, বৃদ্ধ দাদোজীও শিবাজীকে তদ্রূপ করাইতে লাগিলেন।

তিনি শিবাজীকে সঙ্গে করিয়া কখনো গহন বনে, কখনো বা রণস্থলের ভৈরব মূর্ত্তি, কখনো নিবিড় ঘনাচ্ছন্ন পর্ব্বত গহ্বরে, কখনো সুদূর জন-মানব-শূন্য কান্তারে লইয়া যাইয়া সমরোপযোগী শিক্ষা দিতেন। আবার সময় সময় অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে হুকুম করিতেন শিবা! তুমি একাকী পার্ব্বতীয় বৃক্ষ হইতে ফল আনিয়া তোমার নির্ভীকতার পরীক্ষা দাও। এই সকল কার্য্য শিবাজী কখনো অসি হস্তে, কখনো রিক্ত হস্তে সম্পন্ন করিয়া আসিতেন। বৃদ্ধ দাদোজী কোণ্ডদেব রণস্থলের ভীষণ দৃশ্য, যুদ্ধাহত যোদ্ধার কাতর করুণ ধ্বনি, নিহত সৈন্যের বিকট আকৃতি এবং আর্য্যগণের অতীত ইতিহাস বালক শিবাজী হৃদয়ে নিখুঁত ভাবে চিত্রিত করিয়া দিলেন।

বহুদর্শী বৃদ্ধ দাদোজীর এই সকল অমূল্য শিক্ষাই উত্তরকালে শিবাজীকে স্বদেশ প্রেমে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা আগামী বারে দাদোজীর অমূল্য উপদেশ এবং অলৌকিক কাণ্ড বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধটি শেষ করিব।

শ্রীপ্রমথনাথ সরকার।

---

# শিক্ষা।

—:০:—

ক্ষুদ্র গল্প।

১

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, দূর পাহাড়ের গাত্রে সূর্য্যরশ্মিটুকু মিলাইয়া যায়, যায় বিনোদ একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়াছিল, পার্শ্বে বসিয়া তাহার স্ত্রী-উষা।

উষা বালিকা, স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, তবে তুমি কি আজই যাবে?

বিনোদ অতি দুঃখিত স্বরে বলিল-কি করিব! আমার আর থাকলে চলবে না, আমার ছুটি ফুরিয়েচে।

জাজপুরের একটি বাংলা বাটিকা সংলগ্ন উদ্যান মধ্যে এই কথা হইতেছিল। দূরে পশ্চিম দিগন্তে নীলগিরি কৃষ্ণমেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহারই নিম্নে স্থানে স্থানে খর্জ্জুর বৃক্ষরাজীপূর্ণ সুবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের শ্যামলিমা সেই ক্রমঘন সন্ধ্যালোকে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে। অনতি দূরস্থ বৈতরণীর জলকল্লোল আর গোধূলি প্রাপ্তা সবৎসা গাভীর হাম্বারব সকলই সেখান হইতে শোনা যাইতেছিল।

উষা বলিল-এখনও ত তোমার কলেজ খুলতে এক সপ্তাহ দেরী আছে, আর একদিনও থাকতে পার না?

বিনোদ একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বল দেখি?

উষা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়াছিল; তাহার পর লজ্জাবনতমুখী হইয়া ধীরে ধীরে বলিল-আমার বড় মন কেমন কচ্চে।

বিনোদ কতকটা কাতর স্বরে বলিল-কি করব উষা কলেজ বন্ধ হওয়ার পরেই এখানে এসেচি, একবার ও বাড়ী যাইনি; মনে করেচি যে একবার বাড়ী যাব, তার পর ফিরে কলকাতার আসব। কাজেই আমার আর থাকলে চলবে না।

উষা নীরবে রহিল-বালিকার চক্ষু জল ছল ছল করিতে লাগিল।

বৈতরণীর বাঁকের উপর হইতে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়-প্রাপ্ত চাঁদ খানি দেখিতে দেখিতে উঠিয়া পড়িয়া সেই উদ্যান মধ্যস্থ বৃক্ষ সমূহের গাত্রে, দূরস্থ শ্যামল ক্ষেত্রে অজস্র মণি মরকতাদি ছাড়িয়া দিল। নিকটে একটা রজনী গন্ধার গাছে প্রচুর ফুল ফুটিয়াছিল, সন্ধ্যানীলে তাহার গন্ধ চতুর্দ্দিক ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

বিনোদ বলিল তা আমিও যে যাচ্ছি উষা, মনে কোরেনা যে বড় সুখে যাচ্ছি। আমারও তোমাকে ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হচ্চে। বড় আশা ছিল তোমাকে এবার নিয়ে যাব, কিন্তু তাত হলনা।" বিনোদ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

অতীব করুণ স্বরে উষা বলিল-আমি কি করব তা ভাল বুঝতে পারিনা। তবে মা যা বলেন তা সত্য।

"মা কি বলেন ?"

উষা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল-তিনি বলেন যে তুমি বড় গরীব, চাকরী করনা, তোমার খাবার সংস্থান নেই, আমাকে খেতে দেবে কোথা থেকে ? আগে চাকরী কর, বড়লোক হও, তার পর আমাকে নিয়ে যেও।

বিনোদ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল; বলিল আমি গরীব বটে! তা তোমার বাপ যখন দেখে শুনে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেন, তখনও ত আমি গরীব ছিলাম।

উষা। তাতে আর দোষ হয়েচে কি ? তুমি যখন চাকরী করবে তখন ত আর গরীব থাকবে না, যখন তুমি খুব বড়লোক হবে, আমাকেও নিয়ে যাবে, আমিও যাব। নিতান্ত সরল ভাবে উষা কথা গুলি বলিল।

বিনোদও তাহা লক্ষ করিল; বুঝিল যে বালিকা স্বামী এবং পিতামাতা কাহার সহিত সম্বন্ধ অধিক নিকট তাহা আজিও জানিতে পারে নাই। সে যেমন শিক্ষিতা হইয়াছিল তেমনই বলিতেছিল।

বিনোদ বলিল-সে বেশ কথা! আমি যদি কখনও বড়লোক হই, তবেই আবার এখানে আসব, তবেই আমাকে নিয়ে যাব। নচেৎ আর আসবোও না, তোমাকে নিয়ে যাবার আশাও করব না। তুমিও আমাকে ততদিন ভুলে থেকো!

"তা আমি পারব না" বলিয়া উষা কাঁদিতে লাগিল। বিনোদ ব্যথিত হইয়া বলিল কেঁদো না উষা! যদি বেঁচে থাকি, আবার দেখা হবে, তবে যতদিন না বড়লোক হই, ততদিন আর আমাদের দেখা হচ্চে না। তোমার পিতা মাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক্।

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইতে লাগিল। বিনোদকে সেই রাত্রেই যাত্রা করিতে হইবে। জাজপুর সহর হইতে ত্রিশ সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত, এতখানি রাস্তা তাহাকে শিবিকায় যাইতে হইবে। কাজেই উষার নিকট তাহাকে বিদায় লইতে হইল। বিদায় কালে কোন কথাই হইল না, উভয়ে উভয়ের প্রতি নীরবে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া বিদায় লইল। বিনোদ কতকটা

রূপান্বিত কন্তকটা দুঃখিত, উষা অতি মাত্র ম্রিয়মাণ।

যাত্রা কালে বিনোদের শ্বশুর শাশুড়ী দুই জনে দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া পরম- সমাদরে তাহাকে পালকীতে উঠাইয়া দিলেন।

বিনোদের বাড়ী কোন্নগরে। পিতা দ্বারিক বাবু সেরেস্তাদারি করিতেন, এক্ষণে, পেন্সন পাইয়াছেন। সাংসারিক অবস্থা যে বেশ সচ্ছল তাহা নহে। যাহা দুই এক পয়সা জমাইয়াছিলেন, কন্যার বিবাহেই তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলেন। তাহাতেও বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, বিবাহের কিছুদিন পরেই কন্যা হেমলতাকে সিন্দুর খুইয়া থান পরিতে হইল। শোকে ব্রাহ্মণের পাঁজর ভাঙ্গিয়া গেল।

অবিভাবকের আশায় পুলিশইন্সপেক্টার বাবুর সহিত বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হইয়া দ্বারিক বাবুকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছে, বিনোদের বিবাহের পর হইতে এ পর্য্যন্ত বধুকে ঘরে আনিতে পারেন নাই। তাহার বড়লোক পিতা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে জামতার আর্থিক উন্নতি না দেখিয়া তিনি কন্যা পাঠাইতে চান্ না।

একে পেন্সনের পরিমাণ সামান্য, তাহার উপর বিনোদ এখনও পড়াশুনা করিতেছে, অন্য কোন আয় না থাকায়, দ্বারিক বাবু কস্মিন কালে বরের বাপের স্পিরীট দেখাইতে পারেন নাই, বরাবরই বড়লোক বেহাইয়ের খোসামোদ করিয়া আসিতেছেন। বারকতক পুত্র বধুকে দুদিনের জন্যও আনিবার প্রয়াস যে পান নাই এমন নহে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এবার বড় আশা করিয়া বিনোদকে পাঠাইয়াছিলেন, বিনোদ বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিলে তাঁহার দারুণ অপমান বোধ হইল, দুই হস্তে জীর্ণ বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—হরি হে, তোমার ইচ্ছা!

বিনোদ ক্ষুন্নপিতাকে সান্তনা দিতেছে এমন সময়ে রতিকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদকে দেখিয়াই বলিল—কি হল? শালা মেয়ে পাঠালে না?

রতিকান্ত বিনোদের বন্ধু, এক পাড়াতেই বাড়ী। বিনোদের সঙ্গে এক ক্লাসেই পড়ে, দুটীতে বড় ভাব, বিষয় আশায় যথেষ্ট আছে; তথাপি এ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই। কর্ত্তগুলা সম্বন্ধ আসিয়াছিল নিজেই সব ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। রতিকান্তের একটু ছিট ছিল, অনায়াসে বিনোদের শশুরকে গালি দিয়া বসিল।

বিনোদের মাতা বধু আসে নাই শুনিয়া চটিয়া উঠিলেন; বলিলেন আমি আবার ছেলের বিয়ে দেবো। বড়লোক তার মেয়েকে ভাত কাপড় দিতে পারবে জানি, একটা জামাই ত আর ধরে আনতে পারবে না।

রতিকান্ত সে কথার সম্পূর্ণ সমর্থন করিল। হেমলতা বিনোদের অপেক্ষা তিন বছরের ছোট, বধু আসিবে মনে করিয়া বড়ই আনন্দিতা হইয়াছিল; সযত্নে বিনোদের ঘরটি, বিছানাটি, আলমারীটী সাজাইয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে সকল উৎসাহ অন্তর্হিত হওয়ায় তাহার মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। ভগ্ন স্বরে কহিল—কেন মা বড় লোকের মেয়ে ঘরে আনতে গিয়েছিলে?

মা কপালে হাত দিয়া বলিলেন-বরাৎ!

পাগল। রতিকান্ত বলিল বরাৎটা অনেক সময় আমরা নিজেরাই গড়ে তুলি! কিন্তু বেটাকে রীতিমত শিক্ষা দিতে হচ্ছে।

দ্বারিক বাবু হাই তুলিয়াছিলেন, তুড়ি দিয়া বলিলেন হরি হে, তোমারি ইচ্ছা!

রাত্রে বিনোদ আহার করিতে বসিয়াছে পরদিন তাহার কলেজ খুলিবে, তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। মাছের কোলের বাটীটা বাড়াইয়া দিয়া মা বলিলেন বাবা-তুই আর একটী বিয়ে কর্। ঘর দোর অন্ধকার হয়ে থাকে, তা আমি দেখতে পারি না।

বিনোদ একটু হাসিয়া বলিল—কেন মা, তোমার একা বিনোদই ত সব আলো করে রেখেছে।

মা। আহা জন্ম জন্ম করুক্! কিন্তু তুই আর একটী বিয়ে কর্।

রতিকান্ত পাশে বসিয়া ডাঁটা চিবাইতেছিল। মা রান্নাঘরে গেলে হেমলতা আসিয়া বলিল-রতিদা, দাদার আর একটা সম্বন্ধ কর।

রতি। রাতটা পোহাক।

হেম। তা যেন পোহাক্ কিন্তু তাই বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না, একটা চেষ্টা তোমাকে দেখতেই হচ্ছে। দেখ দেখি আমি এতকরে ঘরদুটর সাজিয়ে রাকৃলাম, সব বৃথা হয়ে গেল।

রতি। তোমার দাদাটী যে গুণধর! দেখলে না সে ইচ্ছে যে টেই নেই। বিয়ের নাম শুনে মুখ শুকুচ্চে।

বিনোদ। রতি খেতে বসেচিস্, খা! অত বকিস্নে।

হেমলতা আব্দার সহকারে বলিয়া উঠিল না দাদা, তোমাকে বিয়ে করতেই হবে।

বিনোদ। হেমা, ছুটো খাচ্চি, তাও খেতে দিবিনে?

রতি। দেখলে একবার! এমন শোক উথলে উঠলো যে বাবু আর খেতে পারেন না। কিন্তু আমি যে কথাটা বলি তা শুনলে যে সব গোল মিটে যায়, সেটা একবার মনে আসবে না।

বিনোদ তাহার মুখ প্রতি চাহিল; হেমলতা আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল কি?

তখন উগ্রবাহু রতিকান্ত এমন একটা প্রস্তাব করিল যে তিন জনেই অতিশয় উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বিনোদের আর বিবাহে আপত্তি রহিল না।

প্রিয় নাথ বাবুর বরাবর ইচ্ছা একটী মাত্র মেয়ে পরকে বিলাইয়া দিবেন না। তাই গরীব অথচ লেখা পড়ায় যত্ন আছে দেখিয়া বিনোদের সহিত মেয়ের বিবাহ দেন, ইচ্ছা জামাইটীকে স্বগৃহেই রাখিবেন। জামাই সে কথা বুঝিতে পারে নাই, তিনিও ভাঙ্গিয়া বলেন নাই। অথচ তাঁহার পত্নী কন্যাটীকে শিখাইলেন যে বিনোদ বড় গরীব, তাহাকে খাইতে পরিতে দিতে পারিবে না, বাড়ীতে একটা বই দাসী নাই, তাহাকেই রাঁধিতে হইবে, বাসন মাজিতে হইবে, সে অত কাজ পারিবে কেন? না পারিলে আবার শাশুড়ী ননদের গঞ্জনা আছে! সেই হইতে ঊষা শশুরবাড়ীর নাম শুনিলেই ভয়ে অস্থির হইত।

কিন্তু আবার যখন বিনোদ ফিরিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল যে বড়লোক না হইয়া সে আর শাশুরবাড়ীতে প্রবেশ করিবে না, তখন

উষার মনে বড় একটা খটকা লাগিল। লোক-লজ্জা তাহাকে বাগ মানাইতে পারিল না, তাহার ভারাক্রান্ত মুখশ্রী মার নিকট ধরা পড়িয়া গেল। মা সে কথা প্রিয়নাথ বাবুকে জানাইলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন; বলিলেন, ছেলে বয়সে অমন সবারই হয়, দুদিন বাদে আবার সেরে যাবে।

কই, তাহা ত হয় না! আজি বৎসরাধিক হইল, উষার বিবাহ হইয়াছে, প্রিয়নাথ বাবু তখন কলিকাতায় থাকিতেন, বিনোদ কলেজে পড়িত, শনিবারে রবিবারে শ্বশুরবাড়ীতে পদার্পণ করিত। উদ্বেগ এবং লজ্জা ঘুচিয়া গিয়া অনুরাগ যখন দম্পতীর মধ্যে প্রথম দেখা দিতেছিল সেই সময়েই প্রিয়নাথ বাবু আজপুরে বদলী হইলেন। তাহার পর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। তোমার আমার পক্ষে তত অধিক না হউক, যে দিন গণনা করে তাহার পক্ষে একবৎসর অনেকদিন। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় বিনোদ তাহার মুখচুম্বন করিয়া সেই যে বলিয়াছিল "তুমি আমাকে ভালবেসো ভুলো না," সেই হইতে বালিকা উষা দিন গণিতেছিল। নির্ম্মম পুলিশ ইন্সপেক্টর এত খবর রাখেন নাই, হাজতের আসামীর পক্ষে যেমন বিবেচনা করিয়া থাকেন, এখানেও সেইরূপ করিলেন। কন্যাকে তিনি ঘরে রাখিতে চান, কন্যা কোন দিকে চায়, সেটা তাঁর অগ্রেই জানা উচিত ছিল।

আর বিনোদ; গরীবই হউক, আর যাহাই হউক, বিধাতা তাহাকে যেমন অবস্থাতেই রাখুন, তাহার মুখ খানি বড় সুন্দর, তাহাতে যে হাসিটুকু ভাসিয়া ওঠে, তাহা আবার আরও সুন্দর, আর সেই হাসি হাসি মুখ খানি হইতে যে বাক্যগুলি নির্গত, হয় তাহা বড় মধুর, উষার তাহা শুনিতে বড় ভাল লাগে, সেই মুখ খানি দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। যে বস্তু দেখিতে বড় সাধ-অথচ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার জন্য মন প্রাণ স্বভাবতঃ বড়ই ব্যাকুল হইয়া ওঠে। উষারও তাহাই হইল। বিনোদের সেই সুন্দর মুখ খানি অহঃরহ তাহার মনে জাগিতে লাগিল। বিদায় কালে সেই জ্যোৎস্নাস্নাত উদ্যান মধ্যে বসিয়া বিনোদ প্রাণের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া যে দুই একটী কথা বলিয়াছিল, সেই সময় তাহার মুখশ্রী যে অব্যক্ত করুণোদ্দী-পক ভাব ধারণ করিয়াছিল, উষার স্মৃতি পটে তাহা অঙ্কিত হইয়া যায়। যখনই তাহা মনে পড়িত, তখনই মনোমধ্যে তীব্রযাতনা অনুভব হইত। শেষে উষা মনে মনে বলিতে লাগিল মা! তাকেও রাখতে পারলে না, আমাকেও পাঠালে না, এখন না দেখে যে মরে যাচ্চি!

সৃষ্টিকালে জীবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিধাতা একটু হাসিয়াছিলেন, সে হাসির মর্ম্ম এই যে এক হৃদয়ের ভাব অন্য হৃদয় কিছুতেই সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিবে না। অন্য জীবের কথা ছাড়িয়া দিই, মনুষ্য মধ্যে বিধাতার এই হাসিটুকুর মর্ম্ম বেশ দেখিতে পাই। আমার প্রাণে নিদারুণ ব্যথা, বুক ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তোমাকে নিতান্ত আপনার ভাবিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, বুক চিরিয়া সকলই দেখাইলাম তুমিও মন দিয়া দেখিলে-সব শুনিলে, কাতর হইয়া প্রাণের ব্যথা ঘুচাইবার চেষ্টাও হয়ত করিলে, কিন্তু বুঝিলে কি সেই ভাঙ্গা বুকের

ভিতর পোড়া প্রাণে কি গভীর বেদনা, সে হৃদয়ের তন্ত্রী নিচয়ে কি প্রাণ ফাটা করুণ সুর বাজিতেছে, আর সেই সুরের মর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারিলে কি? না গো না, তাহা পারিবে না! তাহা যদি হইত তাহা হইলে পৃথিবী হইতে দুঃখ বলিয়া যে একটা রাক্ষসী আছে, সেটা সম্প্রদান করিত। দীর্ঘশ্বাস পলাইত, চক্ষের লুপ্ত হইত। কিন্তু পৃথিবী ত সে স্থান নহে-শুধু-দেবতা সে একটু হাসিয়াছিলেন।

৪

শশী ঘটকীর বাহাদুরতে একমাসের মধ্যেই সম্বন্ধ জুটিয়া গেল। যশা গ্রামের অতুল চাটুর্য্যে আসিয়া দ্বারিক বাবুর পায়ে জড়াইয়া ধরিল; বলিল আমার জাত রক্ষা করতেই হবে,- আমার জপা আপনার উঠোন্ ঝাঁট দেবে।

রতিকান্ত মেয়ে দেখিয়া আসিল। তাহার পরেই একদিন শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা ধান দুর্ব্বা বিনোদের মাথায় গিয়া উঠিল।

দূর জাজপুরে বসিয়া প্রিয়নাথ বাবু কেমন করিয়া এই সংবাদ পাইলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তখনই তাঁহারা স্বামীস্ত্রীতে মহাভাবনায় পড়িয়া গেলেন। ইন্সেপেক্টর নালিশ, ডামেজ ইত্যাদি আঁচিতে থাকিলেন, তাঁহার পত্নী যাহাতে বিবাহ স্থগিত হয় তাহারই উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। উপায় ও নাই সময় ও নাই, বড়ই গোল বাধিল!

রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। জামরুল গাছের ঝোঁপের মধ্য হইতে একটা হল্‌দে পাখী মাঝে মাঝে "খুকী হক্" বলিয়া ডাকিতেছে, তাহারই ছায়ায় বসিয়া উষা স্বামীকে পত্র লিখিবার প্রয়াস পাইতেছিল। পার্শ্বে শুইয়া তাহার পোষা হরিণটী মূহুর্মুহু শিং ঘসিতেছিল।

পত্রখানা দুর্গানামের বেশী অগ্রসর হয় নাই। বৈতরণীর বাঁধের উপর দিয়া যে রাস্তাটী বহু-দূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল। তাহার প্রতি চাহিতে চাহিতে উষার মনে হইতে লাগিল, ওই রাস্তা দিয়াই বিনোদ চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় হয়ত ঐ গাছটীর প্রতি, ঐ খোলার ঘর খানির প্রতি সে মুহূর্ত্তের জন্যও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল; এবং ওই গুলি দেখিতে দেখিতে তাহারই জন্য যে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে?

এমন সময়ে শোনা গেল্-প্রিয় নাথ বাবু উগ্র স্বরে বলিতেছেন, না হয় ছোড়া বিয়েই করে, খোরপোষ দিতে হবে—সে ভাবনা নাই। কথাটা উষা ভাল বুঝিতে পারিল না কিন্তু সেটাও মন হইতে গেল না। সে ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশঃ কথাটার এমন অর্থ দাঁড়াইল যে তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। চক্ষের সমক্ষে যাহা কিছু-সেই বৈতরণীর দিগন্ত বিস্তৃত হরিৎক্ষেত্র, দূরের নীলগিরি সকলই যেন ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। নিকটস্থ স্কুল হইতে টিফিনের যে উচ্চ কলরব আসিতেছিল, তাহা ঝিল্লীরবের ন্যায় অতি ক্ষীণ হইয়া গেল।

রাত্রে মা শুনিলেন-উষা আহার করিবে না; ঘরে গিয়া দেখিলেন সে খাটের উপর চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে, পাশ বালিশটাকে কেবলি বুকের নিকট টানিতেছে। গায়ে হাত দিয়া বুঝিলেন জ্বর টর হয় নাই; জিজ্ঞাসা করিলেন, উষা, খাবিনে কেন মা? উষা বিকৃত

কণ্ঠে জানাইল যে তাহার অসুখ করিয়াছে। অসুখটা কি, তাহা মার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, একরত্তি মেয়ের এতটা নষ্টামীও ভাল লাগিল না, বলিলেন বড় বাড়াবাড়ি কচ্চিস্ উষা!

উষা কলাপীবৎ গ্রীবা উত্তোলন করিয় রোরুদ্যমান স্বরে বলিয়া উঠিল কি কচ্চি, কি করিচি আমি কি করিচি, তোমাদের? বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল। সে কান্না আর থামে না! মা আদর করিয়া যতই থামান, সেও বালিশে মুখ গুজিয়া ততই গুমিয়া গুমিয়া কাঁদিতে থাকে। বালিশের প্রান্ত দেশটা ভিজিয়া গেল।

অনেক রাত্রে সে ঘুমাইয়া পড়িলে মা বলিলেন, শেষে কি মেয়ের সুখের পথে চিরকালের জন্য কাঁটা পড়বে? এখন একবার তাদের দিয়ে এস, তারপর তারা ঠাণ্ডা হলে আবার সব হবে। কয়েকদিন ধরিয়া চিন্তার পরেও কোন বুদ্ধি প্রিয়নাথ বাবুর মস্তিষ্কে যোগায় নাই; উপায় না দেখিয়া পত্নীর পরামর্শই সঙ্গত বোধ করিলেন। ভাবিলেন, বিয়েটা ত উপস্থিত বন্ধ হক্।

পরদিন একমাত্র দাসী সঙ্গে উষাকে লইয়া তিনি যাত্রা করিলেন।

তাড়াতাড়ি আভ্যুতিক সারিয়া বেনারস প্যাসেঞ্জারে বরযাত্রী সমেত বর রওনা হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে পুরুষ কেহই নাই, কেবল পাড়ার স্ত্রীলোকগণ জড় হইয়া গোলমাল করিতেছে, এমন সময়ে কন্যা সমভিব্যাহারে প্রিয়নাথ বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। হেমলতা বধু ঘরে তুলিয়া আনিল।

বিবাহটা যে এত শীঘ্র হইবে, তাহা প্রিয়নাথ বাবু একবারও ভাবেন নাই, এখন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। ওপাড়ার মাধুদিদি সকল কাজেই হামরাই থাকেন, মাথায় কাপড় টানিতে টানিতে আসিয়া বলিলেন-আজকে আনন্দের দিনে অমন করে থাকতেই নেই! একটু মিষ্টি মুখ করবে চল।

বিনোদের মাতা বলিয়া পাঠাইলেন-বেহাইকে মন খারাপ করতে বারণ কর, দুটী বোনের ভাত কি আমার হাঁড়িতে হবে না? আমার শশুরেরও ত দুই বিয়ে ছিল।

যে প্রিয়নাথ বাবুর ধমকে চমকে বড়বড় দাগী আসামীরও পরিধেয় নষ্ট হইত, আজি তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বাড়ীতে একপাল স্ত্রীলোক তিনি একা পুরুষ। ঘোমটার মধ্য হইতে যে দৃষ্টি গুলি তাঁহার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহার সঙ্গে যে কতখানি বিদ্রূপ এবং বিদ্বেষ মাখান ছিল, তাহা তিনি ঠিক উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারিলেন না, বড় অধিক বলিয়া মনে হইল। জামাতার অন্তঃপুর পুলিশের থানা নহে, প্রিয়নাথ বাবু মর্ম্মে মর্ম্মে গুমরাইতে লাগিলেন। আহার করিতে গিয়া দেখেন উষা চোরের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে, বুঝিলেন তিনিই তাহাকে চোর বানাইয়াছেন। বুও হেমলতা মাঝে মাঝে বলিতেছিল, আমি বলচি বৌদিদি তোমার ভয় নেই, তুমি অমন করে থেকো না।

মুখে ভাত ওঠে না, তবুও বেহানের মন রাখিবার জন্য দুই চারি গ্রাস গলাধঃকরণ করিয়া প্রিয়নাথ বাবু ভাড়াগাড়ি ষ্টেশনে ছুটিলেন। তখন ট্রেণ নাই, ১৮ নং মালগাড়ী দাঁড়াইয়া

ছিল। ফাষ্টক্লাসের ভাড়া দিয়া তিনি তাহারই ব্রেকভ্যানে উঠিয়া পড়িলেন।

৬

অতুল চাটুর্য্যের একখানি মাত্র চণ্ডীমণ্ডপে পঞ্চাশ জন বর যাত্রীর স্থান সঙ্কুলান হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, ধৈর্য্যমুখুর্য্যের বৈঠকখানায় বরকে বাসা দেওয়া হইয়াছে। রাত্রি আটটার পর হইতেই লগ্ন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে রঙ্গমশাল জ্বালিয়া বর আসিয়া উপস্থিত হইল। অতুল চাটুর্য্যে গলায় কাপড় দিয়া গড়ুরপক্ষীটির ন্যায় সকলের নিকটেই জোড়হাত করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রতিকান্ত "সরস্বতী" কন্‌সার্ট পার্টীর একজন মেম্বর, পার্টীর সঙ্গে আসিয়াছিল, সভার মাঝখানে বসিয়া দ্রুতলয়ে বাজনা জুড়িয়া দিল। সম্মুখস্থ পোড়ো জায়গা হইতে বোমের ঘন ঘন আওয়াজ সমস্ত গ্রামটীকে চকিত করিয়া তুলিল, এবং সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে খয়েরের টিপ পরা ছোট কনেটির বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল।

এমন সময়ে বকমারি সুর বাহির করিতে করিতে একখানি গরুর গাড়ি আসিয়া বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। কটিদেশে অনেকখানি বেদনা লইয়া প্রিয়নাথ বাবু তাহার মধ্য হইতে নামিলেন, রংমশালের অত্যুজ্জল শ্বেতচ্ছটা তাঁহার অন্তর মধ্যে তীক্ষ ছুরিকার ন্যায় বিঁধিতে লাগিল। সভাস্থলে প্রবেশ করিবাই দ্বারিক বাবুর হাত দুটা চাপিয়া ধরিলেন বলিলেন আমায় ক্ষমা কর বেহাই রক্ষা কর!

দ্বারিক বাবু নির্ব্বাক, প্রিয়নাথ বাবু তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া কাকুতি মিনতি করিতেছেন, "ব্যাপার কি ?" "ব্যাপার কি ?" বলিয়া পাড়ার মাতব্বরগণ দুই বেহাইকে ঘেরিয়া উচ্চকণ্ঠে এককালে সহস্র প্রশ্ন করিতেছেন, কতক কতক বরযাত্রী আবার তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কন্‌সার্টপার্টীর যে ঢোলক বাজাইতেছিল সে এই সময়ে জোরে জোরে বাঁয়ায় ঘা দিতে আরম্ভ করিল। বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। সেই গোলযোগের মধ্যে বর আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল।

বর সভা পরিত্যাগ করিতেছে দেখিয়া দুই একজন কন্যা পক্ষীয় আসিয়া পথরোধ করিল। বরের সঙ্গে যে জনকতক বরযাত্রী ছিল-তাহারা বলিল কি জ্বালা! বরকি এতই চোরদায়ে ধরা পড়েছে যে এই গোলযোগেও তাকে সভায় বসে থাকতে হবে? একটু উঠে বেড়াতেও পাবেনা? রতিকান্ত বলিল বর একটু তামাক টামাকু-এটাও বোঝ না?

পাড়া গ্রামে দশ বছরের ছেলেটাও তামাক টানে, কথাটা কেহ অবিশ্বাস করিল না। রাস্তা ছাড়িয়া দিল, পাছে বর সঙ্কুচিত হয়, এই কারণে কেহ সঙ্গেও গেল না।

দ্বারিক বাবু সদাশিব লোক। বধূ ঘরে আসিয়াছে শুনিয়া তাঁহার রাগ পড়িয়া গিয়াছে; তবু বলিতেছেন তা কি করব বেহাই এ ব্রাহ্মণ-কেত আর নষ্ট করতে পারি না, এ যে জাতঃ-পাত হয়। এখন আর উপায় নেই।

ইন্সপেক্টর গিন্নির সাধ্যসাধনা করিয়াছেন, একণে মিত্রমূর্ত্তি ধরিলেন, ধমক দিয়া বলিলেন উপায় নেই; খোর পোষ দিতে পারিবে? ড্যামেজের নালিস করব তা জান?

দ্বারিক বাবু কোন উত্তর দিতে পারিলেন

না, কিন্তু আত্মীয়স্বজনগণ চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কে হে বাপু তুমি, বিয়ে ভাঙাতে এসেচ? বেরোও এখুনি।

আর কোন কথা বলিবার আগেই প্রিয়নাথ বাবু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন জানেন তোমরা আমি একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর?

বিশ্বেশ্বর মুখুর্য্যে গ্রামের জমীদার, অত্যন্ত দুর্ম্মুখ এবং গোঁয়ার লোক, বলিল অনেক শালা ইন্সপেক্টর দেখিচি, আর ইন্সপেক্টরী ফলিও না চুপ করে থাক।

চুপ করা দূরে থাকুক্ একটা হাতাহাতির উপক্রম হইল। ঠিক সেই সময়েই বরের খোঁজ পড়িল। বর সেই যে উঠিয়া গিয়াছে আর ফেরে নাই। বিশ্বেশ্বর মুখুর্য্যের বৈঠকখানাতেও নাই। বর মিলিল না।

তখন বড়ই হৈ চৈ বাধিয়া গেল. অন্তঃপুরে কান্না উঠিল। কন্যা পক্ষীয়েরা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল এ তোমারই কারসাজি। বর কোথায় বলে দাও, নইলে রক্ষা থাকবে না বলে দিচ্চি। প্রিয়নাথ বাবু নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। অতুল চাটুর্য্যে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল তাহার পত্নী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল ওগো জপার আমার কি হবে গো? জপা তখন বাপের খুঁটি ধরিয়া দেখিতেছিল নিকটস্থ শিব-মন্দিরের পার্শ্বে বৃহৎ তেঁতুল গাছটীতে কত জোনাকীই ঝিক্‌মিক করিতেছে।

পুরোহিত আসিয়া জানাইল লগ্ন ভ্রষ্ট হইয়া যায়। তখন বরযাত্র কন্যাযাত্র অনাহূত বরাপুষ্ট যে যেখানে ছিল সকলেই অতিমাত্র বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বর মুখুর্য্যে অগ্রসর হইয়া বলিল শোন পুলিশের পো, নিজেই বর হও, না হলে মাথা দোফাক করে দেবো।

প্রিয়নাথ বাবু দেখিলেন কলাতলায় গোয়ালার দল বাঁক লইয়া সমবেত হইয়াছে। তিনি বৈবাহিকের পায়ে জড়াইয়া ধরিলেন। ধারিক বাবু বলিলেন "কর কি? কর কি?" বলিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলে হাঁ হাঁ করিয়া প্রিয়নাথ বাবুকে ধরিয়া তুলিল, কিন্তু ছাড়িল না, যেখানে সম্প্রদানের স্থান হইয়াছিল সেই দিকেটানিয়া লইয়া চলিল।

অষ্টমীর জীববিশেষের ন্যায় অবস্থায় পড়িয়া প্রিয়নাথ বাবু পরিত্রাহী ডাক ছাড়িতেছেন, এমন সময়ে পাগলা রতিকান্ত কোথা হইতে আসিয়া ব্যস্তভাবে কহিল, আহা আহা ভদ্র লোককে অমন করে টেন না. ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, এই বলিয়া রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়কে মুক্ত করিয়া দিল।

একটা রেড়ো চ্যাংড়া বলিয়া উঠিল ছেড়ে ত দেবো, তুমি বর হবে না কি? গম্ভীর স্বরে পাগল বলিল হব!

সকলেই বিস্মিত অতুল চাটুর্য্যের কথা ফুটিল না। রতিকান্ত বড়লোকের ছেলে, বীরভূম অঞ্চলে জমীদারি আছে, তাহার উপর কৃতবিদ্য অতুল ভাবিল জপার অদৃষ্ট এতই সুপ্রসন্ন হইবে কি?

বাটীর প্রাচীন দাসী তিনকড়ি জপাকে মানুষ করিয়াছিল সে আহ্লাদে আটখানা হইল ছুটিয়া গিয়া অতুলের স্ত্রীকে বলিল, রেমার বৌ তোমার জপা রাজরাণী হতে চল্লো।

রতিকান্ত বলিল-মশায় ভাবচেন্ কি ? এমন পাত্র আর পাবেন না।

বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে অতুল বলিল বাবা এত ভাগ্য আমার হবে কি ?

রতি। সচ্ছন্দে এখন বসে যান না, লগ্ন ভ্রষ্ট হল যে !

অতুল বসিয়া গেল ; চেলীর কাপড় পরিয়া রতিকান্ত ও বসিল। সম্প্রদান কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল।

পরক্ষণেই বরযাত্রীবেশে বর আসিয়া উপস্থিত। সভাশুদ্ধ লোক অবাক।

গোলমালে কন্সার্ট থাকিয়া গিয়াছিল, এখন আবার বাজিতে লাগিল।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

---

## সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

—:০:—

অভিশাপ।—শ্রীযুক্ত হরিহর শেট প্রণীত একখানি উপন্যাস, গ্রন্থকারের নূতন হস্তের লেখনী প্রসূত হইলেও পুস্তকখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। পুস্তকখানির স্থানে স্থানে এরূপ সুন্দরভাব পরিস্ফুট হইয়াছে যে পাঠক মাত্রেরই ইহা চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিবে। গ্রন্থকার সত্যেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর চরিত্র যেরূপ ধর্ম্মভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না, বাস্তবিক আমরা ইহা পাঠে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়াছি। নরাধম সতীশ চন্দ্রের পাপাচরণ ও তৎপরে ধর্ম্মের কশাঘাতে পুনরায় অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া নিজ চরিত্র সংশোধন করিতে দেখিয়া গ্রন্থকারের চরিত্র চিত্রণের বিশেষ ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি -গ্রন্থকার এইরূপ ধর্ম্মভাব পূর্ণ পুস্তক সাধারণে প্রচার করিয়া বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন করুন।

চিকিৎসা প্রকাশ। একখানি চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র। আজ দুই বৎসর হইল বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। ইহাতে সুচীক্ চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক জাতব্য বিষয় নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ হালদার একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, তাঁহার দ্বারা যে পত্রিকা খানির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। আমরা কায়মনে পত্রিকা খানির দীর্ঘজীবন কামনা করি।

অশ্রু। শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত একখানি ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তিকা, এই পুস্তকখানি সমালোচনায় অনেক স্থানে অতীব নিন্দনীয় হইয়াছে, তজ্জন্য গ্রন্থকার নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন, গ্রন্থখানি যে একেবারে দোষ শূন্য তাহা আমরা বলিতে পারি না, অনেক স্থল ব্যাকরণ দোষ দুষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু পদ্য গুলির স্থানেস্থানে বেশ কমনীয়তা ও ধর্ম্মভাব পূর্ণ, পড়িলে তৃপ্তি হয়, আধুনিক অনুকরণ প্রিয় নব্য কবিদিগের মত "কটমট" ছন্দে গ্রথিত নহে, পদ্য গুলি বেশ মোলায়েম ও প্রাঞ্জল, আমিয়া যাঁদি যাহাতে মনের একটু পবিত্রতা আসে—প্রাণে ধর্ম্মভাব তিলমাত্র উদ্দিপীত হয় তাহাই ভাল, গ্রন্থকার নিরুৎসাহিত না হইয়া ভবিষ্যতে একটু সাবধানতা সহকারে সকল দিক বজায় রাখিয়া লিখিতে চেষ্টা করিলে উন্নতি হইবে।

মানসী।—একখানি মাসিক পত্রিকা, প্রথমে হাবড়া হইতে প্রকাশ হইত এখন কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহা একটী মণ্ডলী সম্পাদকের দ্বারা পরিচালিত। ইহাদের দুই একজন আমাদের পরিচিত, ইহাদের মুখে শুনিয়াছিলাম "মানসী" First Class Magazine কিন্তু ইহাতে তাদৃশ কিছু দেখিতে পাইলাম না। প্রথমে যেমন সকল পত্রিকা প্রকাশিত হয় ইহাও সেইরূপ, "আহামরিও" নহে, নিতান্ত মন্দও নহে। তবে সম্পাদক চতুষ্টয় একত্রে মিলিত হইয়া আরও কয়েক বৎসর পোড় খাইয়া চেষ্টা করিলে, সমবেত চেষ্টার ফলে উন্নতি হওয়া সম্ভব, আমরা নবীন সংযোগিনীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

# বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব।

—:•:—

মহারাজ বাহাদুর! মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত সভ্যমহোদয়গণ! আমি বক্তৃতা করিবার জন্ত দণ্ডায়মান হই নাই; মদীয় প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আপনাদিগের সম্মুখে যে প্রস্তাবটীর উত্থাপন করিলেন, তাহার সমর্থন করিবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইয়া তৎসম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি। সেই প্রস্তাবটী এই—" বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে অনুসন্ধান দ্বারা বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বের ও ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা হউক।" প্রস্তাবটী অতি প্রয়োজনীয়, অতীব গুরুতর,— অশেষ যত্নব্যয় ও আয়াসসাধ্য। এক দিনে, এক মাসে বা এক বর্ষে ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে না; দুই চারিজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে বা দুই চারিশতের রজতমুদ্রার বিনিয়োগে, এই প্রস্তাব কার্য্যকর হইবে না। সত্যানুসন্ধিৎসু সত্যসন্ধ শত শত ঐতিহাসিকের সমবেত ঐকান্তিক সুদীর্ঘ যত্ন ও চেষ্টা এবং অদম্য অধ্যবসায়ে—বিপুল অর্থব্যয়ে ইহার সার্থকতা সম্ভবপর হইতে পারে;—ইহার অনতিক্রমনীয় বিশাল গুরুত্ব পর্য্যাবসানে সম্পূর্ণ থাকিতে পারে। তাহা হইলেই এই প্রস্তাব অক্ষরে অক্ষরে অর্থপূর্ণ হইবে। নতুবা সিদ্ধি সুদূর পরাহত,—সকল অলীক কল্পনা জল্পনায় পর্য্যবসিত হইবে। নগেন্দ্র বাবু সুদীর্ঘ প্রবন্ধে সমালোচ্য প্রস্তাবের গুরুত্ব ও সমীচীনতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সুতরাং সেজন্ত আমাকে কষ্টস্বীকার করিতে হইবেনা।

মহোদয়গণ! বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত; ভাবিয়া দেখুন, কোথায় সুদূর অতীতের কোন্ অতল নিখাতে তাহা নিহিত,—লীয়মান, ক্ষীয়মাণ, অনন্তধ্বংসের তন্দুর স্তূপে লোপ পাইতে উন্মুখ! কিরূপে তাহার উদ্ধার হইবে? কি উপায়ে তাহার বিচ্ছিন্ন —বিভিন্ন —ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত কঙ্কালমালার যথাযথ সমাধানে পুরাতত্ত্বের জরাজীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপযুক্ত সমাবেশ হইবে! কে তাহার রক্তমাংস, পেশী মজ্জা প্রভৃতি তন্তু, কলা ও ধাতুনিবহের বিন্যাস প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে!—এযে ভয়াবহ কঠোর সমস্যা! মহোদয়গণ! "বঙ্গ"—একবার ভাবিয়া দেখুন, এই নাম কোথা হইতে আসিল। বর্ত্তমান ভুলিয়া দূর—সুদূর—অতিদূরাতিদূর অতীতের বিশাল রঙ্গভূমে একবার দৃষ্টিপাত করুন। দেখুন, সেই পুরাকালের কোন অজ্ঞাত পূর্ব্বদিন যুগে নাম নাই, সংখ্যা নাই—সীমা নাই—সেই চন্দ্রবংশীয়

মহারাজা বলির পঞ্চপুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ সুহ্ম ও পুণ্ড্র—পিতার আদেশে পাঁচটী স্বতন্ত্র রাজ্য-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত গঙ্গা ও সরযুর সঙ্গমস্থল ছাড়িয়া ক্রমাগত পূর্ব্বমুখে যাত্রা করিলেন; সম্মুখে নিবিড় অরণ্যানী, অগণ্য নদীসঙ্কুলা,—কচিৎ অভ্রংলিহ বা অনুচ্চ গিরিব্রজে মণ্ডিত;—কচিৎ দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর ও বীজগর্ভ রেখাঙ্কিত—অসীমাবদ্ধ ভূমিখণ্ড বা শাদ্বলসমূহে পরিব্যাপ্ত। অনেক স্থানে দৈত্যদানব ও অযাজ্ঞিক দস্যুগণের পিনদ্ধপর্ণায়তনে সমাচ্ছন্ন। উত্তরে হিমাচলের উত্তুঙ্গ পাষাণ প্রাচীর,—দক্ষিণে ও দক্ষিণপূর্ব্বে তোয়নিধির মেঘমন্দ্রবৎ গভীর গর্জ্জন ও নিবিড় তাল-নারিকেল-শাল-মালিনী বেলাভূমির সফেন সিক্ত লাস্যলীলা। পঞ্চভ্রাতা স্ব স্ব শৌর্য্য সাহায্যে সেই অতি বিশাল প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে,—নদ নদীর প্রকীর্ণ ব্যবধানে, দৈত্যদানব গণের নিধনবিধানে পাঁচটী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই পঞ্চরাজ্যের রাজন্যবর্গ ভিন্ন ভিন্ন যুগের বিভিন্ন কাল বেদবিহিত বিধি প্রণালীর অনুবর্ত্তন করিয়া সেই অযজ্ঞীয় দেশকে কিরূপে পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলেন।—অমূর্ত্তরজার অতুল কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রাগজ্যোতিষপুর, মহাযশা রোমপাদের পবিত্র যজ্ঞভূমি ও মহাবীর কর্ণের শাসনক্ষেত্র অঙ্গদেশে দর্পী সাগরদেবের সমাধিমন্দির পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, মহাতেজা মহৌজা ও প্রদ্যুম্নসেনের লীলানিকেতন কৌশকীকচ্ছ ও বঙ্গ, বীরাগ্রগণ্য ত্রিলোচনের ত্রিপুরা ও কমলাঙ্ক ক্রমে ক্রমে কিরূপে আর্য্যসভ্যতার এক একটী বিশাল কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইল;—একদিন যে দেশের সীমামধ্যে পা রাখিলে দ্বিজ মাত্রকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, সেই অপবিত্র দেশে পবিত্রতার পুণ্যময় প্রবাহে ত্রিলোকপাবনী ভাগীরথীকে বক্ষে ধারণ করিয়া কিরূপে ত্রিজগতের পাবনধর্ম্মের স্পর্দ্ধা করিতে পারিল;—কিরূপে সেই এক কালের ম্লেচ্ছনিষেবিত অযাজ্য দেশ অশেষধর্ম্ম পরায়ণ ঋষিগণের হোমধূমে পবিত্রীকৃত হইল,—তাহা দেখিতে হইবে—দেখাইতে হইবে। ইহাই পৌরাণিকের কার্য্য, পুরাতত্ত্বের পরম প্রশস্ত পবিত্র লক্ষণ।

তাহার পর কুরুক্ষেত্রের প্রলয় সংগ্রামে আর্য্য-বীরত্বের দিগ্দাহি তেজে ক্ষত্রিয়ের প্রচণ্ড তেজোবীর্য্য ও গৌরবগরিমা ভস্মীভূত হইলে যেদিন আভীর, দস্যু ও নীচ শূদ্রগণ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল; যেদিন আর্য্যের রাজলক্ষ্মী বঙ্কতস্করের অঙ্কশায়িনী হইলেন,—যেদিন রাজহত্যা ভারতে প্রায় নিত্য হইয়া পড়িল;—প্রজাবর্গের রাজভক্তিলোপে, রাজ্যশাসনের ক্রমাপকর্ষে,—যেদিন সকল প্রকার ধর্ম্ম ও সামাজিক বন্ধন শিথিল হইতে লাগিল;—জাতিভেদের কঠোর বন্ধন আর তত দৃঢ় রহিল না, এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে রহিত হইয়া আসিল;—যেদিন ভণ্ডতা, স্বার্থপরতা স্বেচ্ছাচারিতা বিপ্লবপ্রিয়তা প্রসারিণী ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল;—সেই দারুণ দুর্দ্দিনে সমগ্র ভারতের সহিত পঞ্চ গৌড়ের কি পরিবর্ত্তন হইল, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইবে—দেখাইতে হইবে। সেই সময়ে শাক্যসিংহের ধর্ম্ম আর্য্যহিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে

সমন্বয়ের বীজ বপন করিলে যখন শুদ্ধসত্ত্ব চন্দ্রবংশীয় রাজগণের সিংহাসনসমূহে গুপ্ত, পাল, শূর ও সেনবংশের নৃপতিগণ আসীন হইয়া দৃঢ়হস্তে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন —যখন পাটলীপুত্র ও ওদন্ত পুরী, গৌড় বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কিরণসুবর্ণ বীরভূমি ও তাম্রলিপ্ত, কমলাঙ্ক ও কামরূপ প্রভৃতি নূতন বা পুরাতন রাজ্যের অভ্যুদয়ে বা পুনঃ সংস্কারে ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মমতের অনুলোম ও বিলোম সংযোগ ও বিয়োগে নূতন নূতন ধর্ম্মমতের সৃষ্টি হইল, তখন বঙ্গীয় রাজনীতি ও সমাজনীতির কি কি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, বাঙ্গালীর জাতীয়জীবন কোন পথে প্রবাহিত হইয়াছিল, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা দেখিতে হইবে—দেখাইতে হইবে। তাহার পর মুসলমানের আগমনে সমগ্র ভারতবর্ষের সহিত বঙ্গদেশে ও হিন্দুর সমাজশরীরে কোন কোন দুর্জ্জয় বিষব্রণের উদ্ভব হইল,—আকবরের কঠোর কর স্পর্শে বাঙ্গালী স্বাধীনতা হারাইয়া কিরূপে অষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হইল,—ক্রমে যখন সপ্তসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া সুদূর শ্বেতদ্বীপ হইতে কতিপয় শ্বেতাঙ্গ আসিয়া বাণিজ্যের বিনিময় ব্যপারে পর্ত্তুগীজ ওলন্দাজ, দিনেমার ও ফরাসী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পাশ্চাত্য শক্তির সংঘর্ষে অগ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক পরিস্থিতিদিগকে কিরূপে দগ্ধ করিয়া ফেলিল, তাহা দেখিতে হইবে—দেখাইতে হইবে। সেই ইংরাজ আজি ভারতের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর।

মহোদয়গণ। এই সমস্ত সুবিশাল ঘটনা পরম্পরায় প্রতীপ স্রোতে ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত—বিপর্য্যস্ত হইয়া আজি বঙ্গ নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া অদম্য অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম, অকম্পিত সহিষ্ণুতা ও প্রগাঢ় গবেষণা সহযোগে বঙ্গের - শুধু বঙ্গ কেন! ভারতের নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া, নানা ভাষার মন্থন করিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। তবে বাঙ্গালার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস রচিত হইবে। আমি আবার বলি,—এক দিনে, এক মাসে বা এক বর্ষে এই পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস রচিত হইবে না। দুই চারিজনে অক্লান্ত পরিশ্রমে বা দুইচারিশতমের রজতমুদ্রার ব্যয়ে ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে না। সত্যানুসন্ধিৎসু সত্যসন্ধ শত শত ঐতিহাসিকের সমবেত ও ঐকান্তিক সুদীর্ঘ চেষ্টা, যত্ন ও অদম্য অধ্যবসায়, বিপুল অর্থব্যয়ে ইহার সার্থকতা সম্ভবপর হইতে পারে। সেদিন কবে আসিবে?—যেদিন বঙ্গের ধনকুবেরগণ ও প্রতিভা একত্র মিলিত হইয়া এই মহাব্রতের উদ্‌যাপনে ধনসম্পত্তি ও প্রাণ মন উৎসর্গ করিবেন; সেদিন কবে আসিবে? যেদিন ভারতের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে—পরিত্যক্ত, বিসর্জ্জিত, ধ্বস্তবিধ্বস্ত পুরপ্রাচীর ও ভগ্নাবশেষরাশির অভ্যন্তরে শত শত খুসিদাইদিস, জিনোফন, ও গিবন, ষ্টানলি ও লিভিংষ্টোন অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার করিবেন? তবে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠিত হইবে;—বাঙ্গলার একখানি সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস রচিত হইবে। *

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* ১৩১৪ সালের ১৭ই কার্ত্তিক কাশীমবাজার রাজভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ মহাশয় এই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সম্পাদক।

# কবির দশা।

১

স্বামীর সংসারের দিকে দৃষ্টি নাই দেখিয়া সরলা একদিন কহিল "তুমি কি সন্ন্যাসী হয়ে যাবে নাকি?"

নরেন্দ্র তখন স্থিরভাবে বসিয়া ভাবিতেছিল।

সরলা আবার কহিল "তুমি ভেবেছ কি? মনে কর কি তুমি চুপটী কোরে বোসে থাক্‌লেও অন্ন জুটবে?

এইবার "হাঁ।" করিয়া নরেন্দ্রনাথ ঘাড় ফিরাইল। সরলাও ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সরলা যে এতক্ষণ কি কথা বলিতেছিল তাহা নরেন্দ্র নাথ ভাল করিয়া শুনে নাই। সুতরাং সে কিছু বুঝিতে পারিল না।

অল্পক্ষণ পরে কেরোসিন তৈলের পাত্র, ও কতকগুলি পুস্তক লইয়া সরলা নরেন্দ্র নাথের সম্মুখে আসিল। নরেন্দ্র নাথ কহিল "বইগুলা নিয়ে এলে কেন?"

উত্তর হইল পোড়াব বলে—

নরেন্দ্র নাথ উঠিয়া পুস্তকগুলি নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া বলিলেন "অত ভাল নয়।" তখন সরলা কহিল এইবার তোমার চৈতন্য হয়েছে এখন যা বলি শোন।

সরলা বুঝিত স্বামীরত্নই অকর্ম্মা হন না কেন, পুস্তক পোড়াইবার ছল করিলে তিনি নিশ্চয়ই অর্দ্ধচিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইবেন কারণ সরলা জানিত পুস্তক গুলি তাহার স্বামীর অত্যন্ত প্রিয়।

"সরলার কথা শুনিয়া নরেন্দ্র কহিল—কি বলিবে বল।"

তখন সরলা কহিল-"তুমি জাননা সংসারের অবস্থা কি রকম। তুমি একমনে বই পড় আর কি ভাব। ও রকমভাবে থাক্‌লে আর কি চলে। চাল আজ ফুরলো। চুপটী করে বসে থাক্‌লে খাবার কি কেউ মুখের কাছে দিয়ে যাবে। সংসারের দিকেও একবার চাও!"

"সংসার?" নরেন্দ্র নাথ কহিল "সংসারে কে? তুমি আর আমি। এতবড় পৃথিবীতে কি দুটী প্রাণীর অন্ন মিলবে না। ভাব কেন?"

সরলা কহিল "ভাবি আর সাধে কোরে? তুমি ভাবনা; তাই আমি ভাবি। তুমি যদি ভাবতে তাহলে আর আমি এত ভাবতেম না।

নরেন্দ্রনাথ কহিল "বেশ আজ হতে ভাবব। তোমাকে বিবাহ করেছি, তোমার প্রতিপালন কর্‌তে হবে ত, বেশ আর একবার চাকরীর চেষ্টা দেখি।

সরলা চলিয়া গেল। নরেন্দ্র ভাবিল লোকে কেন সংসার করে। সংসারে সুখ কোথায়? কেন মানুষে পরের ভার নেয়? এই ভাবিতে ভাবিতে নরেন্দ্রের চিন্তা গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। সে আবার ভাবিল সংসার ভিন্ন সুখ কোথায়? সংসারে কত সুখ, কত শান্তি, সে সুখের, সে শান্তির কে ইয়ত্তা করিতে পারে? সংসারে কি মায়া, কি স্বর্গীয় প্রেম! নরেন্দ্র নাথ চিন্তা সাগরে আবার ডুব দিল কিন্তু তল-দেশ স্পর্শ করিতে পারিল না। সে অবশেষে ভাবিল সংসারে একাধারে সুখ দুঃখ। সংসারে বড় দুঃখ, সংসারে বড় আনন্দ, সংসারে পাপ,

আবার সংসারে পুণ্য। সংসার স্বর্গ; সংসার নরক, দুর্ব্বল চেতারা সংসারে নরক ভোগ করে; মহান ব্যক্তি সংসারে স্বর্গভোগ করে। নরেন্দ্র তাহার চিন্তার সীমাস্বরূপ একটী কবিতা আবৃত্তি করিল—'সংসার? তোরেরে আমি ভাবিব কিরূপ।"

বহুকষ্টে অনেক চেষ্টার পর নরেন্দ্রের একটী চাকুরী মিলিল। পাড়ার মুখুয্যে মহাশয় তাঁহার একটী চাকরী করিয়া দিলেন। চাকুরী হইল বৈদ্যনাথ পোষ্ট অফিসে। নরেন্দ্র বুঝিল তাঁহাকে নিজগ্রাম ছাড়িয়া অনেক দূরে যাইতে হইবে। কিন্তু স্ত্রীকে একা ফেলিয়া সে কিরূপে যায়। অবশেষে সরলাকে মুখুয্যে মহাশয়ের বাটীতে রাখিয়া যাওয়াই স্থির হইল।

মুখুয্যে মহাশয় নরেন্দ্রের পিতার বন্ধু। সমস্ত গ্রামে তাঁহার সুখ্যাতি আবালবৃদ্ধ বনিতার মুখে শুনা যাইত। সুতরাং নরেন্দ্র তাঁহার নিকট স্ত্রীকে রাখিয়া যাইতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না।

বাটী ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় সরলা কহিল "এস তুমি। তুমি তোমার সংস্থান কর। আমি অনাহারে একবসনে কাল কাটাতে পারি কিন্তু তোমাকে যে রকম দেখতে পারি না। যাও তুমি আমায় মাঝে মাঝে এক একখানা পত্র লিখো। নরেন্দ্র কহিল "সরলা, জেনে রেখো, তোমার কাছে আমার প্রাণমন ফেলে রেখে আমি চলেছি। তোমায় চিঠি পত্র লিখবো না?"

নরেন্দ্র অগ্রসর হইল। সরলা...সম্মুখে আসিয়া কহিল তবে "কবে আসবে?" সংসার [illegible] বিদায়।

নরেন্দ্র কহিল "সরলা, আমি আর আসচি না। এখানে আর আসবার প্রয়োজন কি? দিন কতক পরে আমার কাছেই তোমাকে যেতে হবে।"

নরেন্দ্রনাথ রাত্রি দশটার ট্রেণে বৈদ্যনাথে রওনা হইল।

২

নূতন দেশে আসিয়া প্রথমতঃ নরেন্দ্রনাথ বড় আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু দিন কতক পরে তাঁহার সে আনন্দ ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। একা চুপটী করিয়া বসিয়া থাকিতে সকল সময় তাহার ভাল লাগিত না।

কোলাহল পূর্ণ স্থানে থাকিয়াও মানুষ সংয়ে সময়ে একটু নির্জ্জনতা অনুভব করে। নরেন্দ্র যে কোলাহল পূর্ণ স্থানে ছিলেন না—এমন নহে। প্রতিদিন তীর্থ যাত্রীদের কোলাহলে তাঁহার নিদ্রা হইত না। সমস্ত দিন ভিক্ষাজীবিদিগের ঢাকের শব্দে তাহাকে কাতর হইতে হইত। এত কোলাহল-সত্বেও নরেন্দ্র ভীষণ নির্জ্জনতা অনুভব করিতেন কারণ তিনি যে দিকে চাহিতেন সে দিকেই বৃক্ষ-পরিত্যক্ত মরুভূমি।

নরেন্দ্রনাথ সন্ধ্যাকালে কিছুক্ষণ অবকাশ পাইত। সেই সময়ে সে একবার ভ্রমণে বাহির্গত হইত। ধূসর গিরিশ্রেণী, পুষ্পিত লতা, উপলবন্ধুর পথ, খরতর বাহিনী, স্বচ্ছ সলিলা, বক্র গামিনী নদী প্রভৃতি দর্শন করিয়া তাহার পিপাসা মিটিত না।

একদিন সে একটী নদীতীরে বসিয়া আছে। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। দূরে সূর্য্যের রক্তিম আভা গিরিপার্শ্বে বর্ত্তমান।

নরেন্দ্র বসিয়া আছে, তাঁহার চিত্ত তখন দিগন্ত-ব্যাপী অনন্ত আকাশে নিশ্চল হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ একমনে বসিয়া আছে। এমন সময় পশ্চাত হইতে কে কহিল "মহাশয়ের বাটী কোথায়?" নরেন্দ্রনাথের উত্তর পাওয়া গেল না। অল্পক্ষণ পরে আবার অধিকতর উচ্চৈস্বরে কে কহিল "মহাশয়ের বাটী কোথায় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

নরেন্দ্রনাথ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন একটি চশমাধারী শুভ্রবসন পরিহিত, যুবক যষ্টি হস্তে দাঁড়াইয়া ধূমপান করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ কহিল "আমাকে বলছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আমার নাম শ্রীনরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাটী বর্দ্ধমান জেলায়। মহাশয়ের নাম?

"আমার নাম ও ঐ"

তবে বেশ ভালই হয়েছে। মহাশয় করেন কি?

"আজ্ঞে এই কাটাকাটি ব্যাপার"

"সে কি রকম।"

আজ্ঞে আমি এখানকার ডাক্তার, আপনি করেন কি?

"আমি এখানকার পোষ্ট মাষ্টার।"

ডাক্তার মহাশয় এইবার বসিলেন এবং নরেন্দ্রনাথের কাণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া কহিলেন "মহাশয়কে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"কি; বলুন।"

মহাশয় কি একটু কানে খাট। বলুন, আমার নিকট ঔষধ আছে।"

"তাত বোধ হয় না।"

"তবে কি মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে।"

"কই তাও তো দেখতে পাই না। কেন বলুন তো।"

"এমন কিছু নয়। প্রথমে আমার কথা শুনেন নি কিনা তাই ভাবছিলেম বুঝি আপনি কাণে একটু খাট।"

"আজ্ঞে, কাণ খাট নয়, তবে একটু অন্য মনস্ক হয়েছিলেম।"

"কেন, কোন কুট চিন্তা আছে নাকি?"

"আজ্ঞে না, এমন কিছু কুট চিন্তা ছিল না। কেমন নদিটী বয়ে যাচ্ছে তাই দেখছিলাম।"

'ঢেউ গুনিতেছিলেন, না কত জোরে বইচে তাই দেখছিলেম বুঝি।

"দেখছিলেম নদীটী কেমন সুন্দর, কেমন কুল কুল বয়ে যাচ্ছে।"

"নদী সুন্দর? কথাটা বুঝলেম না। ওহো, লোকে যাদের কবি বলে আপনি বোধ হয় সেই শ্রেণীর লোক, "নদীর সৌন্দর্য্য দেখে এলেন কি?"

"কি জানি।"

নরেন্দ্র নাথকে আবার অন্য মনস্ক দেখিয়া ডাক্তার মহাশয় কহিলেন "তবে আমি আপনাকে আর বিরক্ত করবো না।"

"বিরক্ত? বলেন কি মশায়? চলুন এক সঙ্গেই যাই।

দুইজনে ধীরে চলিলেন। ডাক্তার মহাশয় চলিলেন হাঁসপাতালে। নরেন্দ্রনাথ চলিলেন পোষ্ট আফিসে।

৩

সরলা মুকুয্যে মহাশয়ের বাটীতেই রহিল।

বৃদ্ধ তাহাকে বড় যত্ন করিতে লাগিলেন। সরলার কষ্ট হইতেছে কি না, সরলা যথাসময়ে আহার পায় কিনা, বৃদ্ধ সর্ব্বদাই গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিতেন।

সরলা স্বামীর পত্র মাঝে মাঝে পাইত। সে জানিল বৈদ্যনাথে বাটী ভাড়া অত্যন্ত অধিক সেই জন্য তাহার স্বামী তাহাকে লইয়া যাইতেছেন না।

সরলা বুড়ো মশায়ের নিকট যত্ন পাইত, কিন্তু তাহার জমিদার গৃহিণীর প্রতিদিন গৃহিণীর তিরস্কার তাহার অসহ্য বোধ হইত। গৃহিণী কেন যে তাহাকে এত তিরস্কার করিত বলিতে পারি না। তবে এক একজনের ঐরূপ স্বভাব থাকে।

দুঃখে, মনোবেদনায় সরলার ছয় মাস কাটিল, সে এখন আর স্বামীর পত্র পায় না। পূর্ব্বে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই পত্র আসিত। কিন্তু আজ প্রায় একমাস, একখানিও পত্র আসে নাই। সরলা ভাবিল স্বামী কি আমায় ভুলিয়া গেলেন।

পত্র আসিত কিন্তু সরলার হস্তগত হইত না। গৃহিণী ভৃত্যকে বলিয়া দিয়াছিলেন যদি কোন পত্র আসে, সে গুলি প্রথমে আমার হাতে দিবে। ভৃত্য তাহাই করিত। গৃহিণী সরলার পত্রগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতেন।

অনেকদিন অতিবাহিত হইল। সরলা পত্র পাইল না।

একদিন সন্ধ্যালোকে সরলা বসিয়া কি ভাবিতেছে। এমন সময় গৃহিণী ডাকিলেন "বউ এক বাটী দুধ নিয়ে আয়।" সরলা উঠিল। গৃহিণী একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া কহিলেন "হাঁগা মেয়ে তোমার যে কি এত ভাবনা বাবু বুঝতে পারি না। তোমার খাবার কষ্ট নেই। যা চাইচ তা পাচ্ছ। এততেও তুমি অন্য মনস্ক হয়ে ভাববে? সংসারের একটা আধটা কাজ করলে চলে ত।

সরলা কহিল এতক্ষণ ত কাজ ছিল না মা। তাই বসেছিলুম। গৃহিণী চুপ করিলেন।

সরলা দুগ্ধ লইয়া অগ্রসর হইল; নিকটে একটি বিড়াল ছিল সরলা আসিতেই বিড়ালটি ভয়ে আর কোন স্থান না পাইয়া তাহার পায়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল, ভীরুস্বভাবা সরলা যেমন সরিয়া আসিবে অমনি দুধের বাটিটা ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল। গৃহিণীর গলাও অমনি ঝন্ করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন "দেখ মেয়ে। অমন করলে ত বাপু তোমায় রাখতে পারি না যার খেতে হয় তার দিকে একটু টানিতেও হয়। বুড়ো মাগি তুমি, দুধের বাটিটা ফেলে দিলে?" সরলা দোষের আধিক্য কমাইবার জন্য বলিল। মা! আমি ইচ্ছে করে ফেলিনি বেরালটা গায়ে লাফিয়ে পোড়াতে আমি ভয় পেয়েছিলেম তাই বাটিটা পোড়ে গেল।"

"আহা কচি খুকিটি। মাগীর কথা শুনেছ। বলে আমি ত ইচ্ছে করে ফেলিনি। ও মুখেতে নুড়ো জালিয়ে দিতে হয়। যার স্বামীর দুকড়ার মুরোদ নাই তার অত লম্বা চৌড়া কথা কেন?

সরলা শুনিল। কোন উচ্চ কথা বলা তাহার স্বভাব নয়, মনঃকষ্টও ঈশ্বর ক্রন্দন ছাড়া তাহার আর কোন উপায় নাই।

আজকাল নরেন্দ্রনাথ ডাক্তারের বাটীতেই থাকেন। ডাক্তার তাঁহাকে নিজের বাটীতেই স্থান দিয়াছেন। দুইজনে বড় বন্ধুতা। একদিন ডাক্তার বলিলেন "চলুন নরেন বাবু? একটু বেড়াতে যাওয়া যাক্।" নরেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন।

সন্ধ্যাকালে দুইজনে চলিলেন। নিকটে একটি পাহাড় আছে. পাহাড়টীর নাম নন্দন। দুইজনে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পাহাড়ের উপর উঠিলেন। বহুদূরে অসংখ্য কাল গিরিশ্রেণী দৃষ্ট হইল। দুইজনে পাহাড়ের উপর একটি ভগ্নমন্দিরের নিকট বসিলেন। তখন একবার প্রকৃতির বিশ্ববিমোহন ছবি তাঁহাদের নয়ন পথে পতিত হইল। কত নদী, কত বৃক্ষরাজি, কত শ্যামল গিরি তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। দুইজনের ক্লান্তি দূর হইল। ডাক্তার কহিলেন "নরেন বাবু স্থানটা বেশ স্বাস্থ্যকর।" নরেন্দ্রনাথ কহিলেন "সে আপনারা বোঝেন, স্থানটী সুন্দরও বটে।"

অবিলম্বে সন্ধ্যার ম্লান আভা পূর্ব্ব গগণে প্রতিভাত হইল। হুহু করিয়া একটা বাতাস পাহাড়ের ছোট ছোট দুই একটী আগাছার ভিতর দিয়া চলিয়া গেল। ডাক্তার উঠিলেন এবং নিকটে একটি বৃক্ষের নিকট গিয়া বলিলেন "দেখুন নরেন বাবু ভূর্জ্জপত্রের গাছ দেখুন" নরেন্দ্রনাথ নিকটে গিয়া গাছটি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন। ডাক্তার মহাশয় বলিলেন "নরেন বাবু গাছটী কত উঁচু হবে বলুন দেখি?"

"প্রায় ২০ হাত উচ্চ হবে।" ডাক্তার মহাশয় একটি ভূর্জ্জবৃক্ষের পত্র ছিঁড়িয়া লইলেন, নরেন্দ্রনাথও একটু ভূর্জ্জত্বচ সংগ্রহ করিলেন। ডাক্তার মহাশয় নরেন্দ্রনাথকে ভূর্জ্জত্বচ গ্রহণ করিতে দেখিয়া কহিলেন ওতে কি কোন ঔষধ হয়? "তা বলিতে পারি না।" "তবে ওর দরকার কি?"

"দরকার এমন কিছু নয়। তবে পুরাকালে ইহাতে লেখা হইত।

"কেমন লেখা যায় তাই পরীক্ষা করবেন।" "তা করবোনা। তবু একটা স্মৃতি চিহ্নের মত রেখে দেবো। গাছের ছালটা দেখলে অনেক কথা মনে পড়ে, ছালটী দেখে পুরাকালের কথাটা অনেক ভাবতে পারি. সেই প্রাচীন ঋষিদের কথা মনে পড়লে বড় আনন্দ হয়।

ডাক্তার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন নরেন বাবু! রাগ কোরবেন না। আপনার কি কোন ব্যারাম আছে। গাছের ছালটা দেখে ঋষিদের কথা মনে কোরতে পারেন। কেমনা দুটো জিনিষ একসঙ্গে কল্পনা কোরলে, দুটো জিনিষ এই রকমে একসঙ্গে অভ্যস্ত হোলে একটা আর একটাকে স্মরণ কোরিয়ে দ্যায়। কিন্তু ওতে আনন্দ হয় কেন!

নরেন্দ্রনাথ উত্তর করিল "কিজানি বলুন। "কার্য্যের কারণ জানেন না।" এই কথা বলিয়া ডাক্তার আবার হো হো করিয়া হাসিলেন "প্রত্যেক কার্য্যের কারণ জানবার চেষ্টা করা উচিত।"

নরেন্দ্রনাথ কহিলেন "ডাক্তার। স্বীকার করি, প্রত্যেক কার্য্যের কারণ আছে। কিন্তু সকলের কারণ ঠিক করা যায় কি ?" এমন অনেক কাজ আছে, যার কারণ তোমার বিজ্ঞান নির্ণয় কোরতে পারেনা। তুমি বিজ্ঞান শাস্ত্র পোড়েছ, যা তোমার বিজ্ঞান জানে তাই তুমি জান, তারপর বিজ্ঞান ছাড়িয়ে তুমি অগ্রসর হোতে পার না, কতকগুলি জানা কথা নিয়ে তুমি আন্দোলন কর। ঋষিদের কথা মনে পোড়লে আনন্দ হয় কেন তা' তুমি বুঝতে পার না, তুমি কারণ নির্ণয় কোরে দাও।"

তুমি তো বিজ্ঞান শাস্ত্র পোড়েছ।" ডাক্তার কহিলেন "ঋষিদের কথা মনে পোড়লে আনন্দ হবার কোন কারণ তো দেখতে পাচিচ না; নরেন বাবু, বোধ হয় আপনার কথাটি মিথ্যা।

নরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন "ডাক্তার আমার কথা মিথ্যা নয়। আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি তোমার বিজ্ঞান শাস্ত্র কোথা হতে উদ্ভূত। দর্শনই বিজ্ঞানের মূল। প্রথমে আমরা দর্শন করি, তারপর সমস্ত ঘটনার অন্তর্নিহিত একটি নিয়ম স্থির করি। সেই নিয়ম বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। তা' হলে ডাক্তার, দর্শনের পর বিজ্ঞান। আমরা যত দেখব, বিজ্ঞান শাস্ত্রের কলেবর ততই বৃদ্ধি পাবে। আমি যা দেখছি সেটাকে যদি মিথ্যা বল তা'হলে বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি হ'বে কি ?"

ডাক্তার কহিলেন "আপনার কথা স্বীকার করি। কিন্তু আপনি যে বোলছেন ঋষিদের কথা মনে পোড়লে আপনার আনন্দ হয়, এটা সত্য কি মিথ্যা কিরূপে বুঝবো ?"

নরেন্দ্রনাথ কহিলেন "তা বোঝাবার আমার শক্তি নেই, আমি জানি—আমি আনন্দ পাই।"

ডাক্তার মহাশয় আর কোন কথা না বলিয়া ভূর্জ্জপত্রটি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি বলিলেন "উঠুন নরেন বাবু আর বিলম্ব কোরবেন না।"

নরেন্দ্রনাথ তখন স্থির, তখন তাহার দৃষ্টি নদীর উপর স্থির সংলগ্ন, তখন তাহার প্রাণ প্রকৃতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। নদীর চন্দ্র-করোদ্ভাসিত অর্দ্ধাঙ্গ, বৃগচ্ছায়াবৃত অর্দ্ধাঙ্গ তাহার অন্তর আকুল করিয়া তুলিল। সহসা কবির মুখে কবির কথা উচ্চারিত হইল—

"বেণীভূত প্রতণ সলিলাসাবতীতস্য সিন্ধোঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরু ভ্রংসিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।"

ডাক্তার চীৎকার করিয়া কহিলেন " কি?—কি ?"

নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল। "এঁ্যা—কি ?"

ডাক্তার কহিলেন "আপনি কি বোল্লেন ? আচ্ছা, চলুন রাস্তায় কথা হবে। এখন উঠুন।

দুইজনে উঠিলেন, পাহাড় হইতে নামিলেন, ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন "নরেন বাবু, তখন কি বোলছিলেন ?"

"কখন ?"

"যখন আপনাকে উঠতে বলি"

কিছু বলিনিতো ?

"না মশায় কি যেন সংস্কৃতশ্লোকের মত বোধ হল।"

ওঃ—সে মেঘদূতের একটা শ্লোক মেঘদূত?' আপনার মতন একটী লোকের হাতে পোড়ে যেটা আমি তিক্ত ঔষধ খাওয়ার মতন পোড়েছিলুম।"

"পোড়েছিলেন বুঝেছিলেন কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই সব বই পোড়ে কি হয়? আপনি এই যে শ্লোকটী বল্লেন, এটার অর্থ আমার কিছু কিছু মনে পড়ে। আহা কি ভাব? নদীর তরঙ্গকে লেখক বেণী বোলছেন। এ গুলি অতি মূর্খতা নয়?"

"আজ্ঞে মূর্খতা নয়। ভাব অতি সুন্দর।"

"কি সে সৌন্দর্য্যটা আমার বুঝিয়ে বলুন দেখি"

"ডাক্তার! সৌন্দর্য্য উপভোগ না কর্‌তে পার্‌লে এ বোঝান যায় না?'

ডাক্তার মহাশয় কোন কথা কহিলেন না। দুইজনে গৃহসন্নিকটে আসিলে তিনি কহিলেন "আচ্ছা নরেন বাবু, বইখানি এনে আজ রাত্রে কবির মূর্খতা প্রমাণ কোরবো।"

নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, তা কোর্‌বেন—কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে তর্ক কের্‌তে পারবো না, কাব্যে স্বর্গীয় সুখ, স্বর্গীয় সুখ বর্ণনা করা যায় না।"

ডাক্তার কহিলেন "স্বর্গীয় সুখ কি? স্বর্গ কি? নরেনবাবু বাজে কথা ছেড়ে দিন।"

"আপনি স্বর্গ মানেন না? ডাক্তারে বলিলেন "না এখন ঘরে চলুন।"

৬

সরলার হৃদয়নিহিত দুঃখান্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল। স্বামীর সংবাদ অভাবে, গৃহিনীর কঠোর তিরস্কারে সরলা ক্রমে ক্রমে অধীর হইয়া পড়িল।

একদিন সকালে মুকুয্যে মহাশয় গৃহিনীকে ডাকিয়া কহিলেন "গৃহিনী; আজ আমি একটু কাজের জন্য বাহিরে যাব। বোধ করি দিন দুই আস্‌বনা। তুমি তাড়াতাড়ি খাবার যোগাড় কর।" এই বলিয়া মুকুয্যে মহাশয় চলিয়া গেলেন।

গৃহিনী চীৎকার করিয়া কহিলেন "ঝি, বৌমাকে ভাত চড়াতে বল, এখন শুয়ে থাকলে চোলবে না।" সরলার সেদিন মাথা ধরিয়া একটু জ্বর হইয়াছিল।

ঝি কহিল "মাঠাকরুণ, তার জ্বর হোয়েছে; সে কি উঠতে পারবে। গৃহিনী চীৎকার করিয়া কহিলেন" কেন পারবে না, খেতে গেলেই কাজ কোরতে হয়।

সরলা পার্শ্বের ঘরেই ছিল। গৃহিনীর কথাগুলি সে শুনিতে পাইল। কোন কথা না কহিয়া সে ধীরে ধীরে রান্নাঘরে গিয়া ভাত চড়াইল।

যথাসময়ে মুকুয্যে মহাশয় আহারের জন্য ঘরে আসিলেন। তখন গৃহিনী তাড়াতাড়ি ভাত আনিয়া দিল; মুকুয্যে মহাশয় আহার সমাপনান্তে চলিয়া গেলেন।

সকলেই আহার করিল। সরলা সেদিন আহার করিল না, কারণ তখনও তাহার সামান্য জ্বর ছিল।

সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া অনশনক্লিষ্টা সরলা সন্ধ্যাকালে প্রাঙ্গনস্থিত একটী বেদিকার উপর বসিল। বুঝি সে মনে করিয়াছিল সন্ধ্যার বাতাসে যে একটু সুস্থ হইবে। কিন্তু অভাগিনীর তাহাও হইল না? একবার যখন সন্ধ্যাবায়ু তাহার শরীর স্পর্শ করিল অমনি শত

শত অতীতের কথা তাহার মনে পড়িল। মনে পড়িল পিতৃগৃহে ভাবীসংসারজ্বালারহিত হৃদয়ের অপরিসীম আনন্দ, মনে পড়িল স্বামী-গৃহের সেই বিস্মৃত আনন্দ অমনি সঙ্গে সঙ্গে সেই বিদায় স্মৃতি, সেই নরেন্দ্রনাথের বিদায়কালীন কথা "আমি আর এখানে আসবো না। দিন কতক পরে তোমাকেই আমার কাছে আসতে হবে।" যেমন কথাগুলি তাহার মনে পড়িল, অমনি কি একটা না ভয়ে ক্ষণকালের জন্য তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল।

সহসা গৃহিনীর পঞ্চম বর্ষীয় একটী শিশু দৌড়িয়া আসিয়া সরলার একটী অঙ্গুলী কামড়াইয়া ধরিল। সরলা বহুকষ্টে বালকটীকে সরাইয়া দিল। বালকটী মহানন্দে "মা, আমি কামড়িছি" বলিয়া যেমনি দৌড়িয়া যাইবে অমনি হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল। সরলা দৌড়িয়া বালকটীকে তুলিল। তাহার অঙ্গুলী দিয়া রক্ত পড়িতেছিল। বালকটীকে ধরিলে দুই এক ফোঁটা রক্ত শিশুর গাত্রে লাগিল।

গৃহিনীই বালকটীকে সরলার রক্তপাত করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, যখন বালকটী পড়িয়া গেল তখন তিনি বুঝিলেন, ভাল রকম যন্ত্রণা সরলা পাইলনা, বালকটীও একটু যন্ত্রনা পাইল, অতএব সরলাকে আর একটু কষ্ট দেওয়া উচিত। এই ভাবিয়াতিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। নিকটেই একগাছি ঝাঁটা পড়িয়া ছিল, গৃহিনী সেইটী গ্রহণ করিয়া সরলার নিকট আসিয়া উচ্চস্বরে বলিলেন "পাজী মাগী ? বাছাকে মেরে রক্ত পাত কোরলি।"

সরলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল হা ভগবান! গৃহিনী অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "তম্বেরে পাজি আবাগী, আমাকে ভগবান্‌, দেখান হচ্ছে ?" তার পর গৃহিনীর ঝাঁটা সরলার পৃষ্ঠে পতিত হইল। মুকুর্য্যে মশায়ের গৃহ লক্ষ্মীও বুঝি সেই দিন হইতে চঞ্চল হইয়াউঠিল।

দ্রুতপদে গৃহিনী চলিয়া গেলেন। সরলা উঠিয়া বসিল। তখন তাহার মুখে কাতরতা ব্যঞ্জক কোন শব্দ ছিলনা। তখন সে নীরব, নিশ্চল। তখন যেন তাহার বিষাদকালিমাঙ্কিত মুখে স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল "জগতে যত তীব্র দুঃখ আছে সব আসুক।"

সেদিন বৈকালে গৃহিনী নিজে রন্ধন করিলেন পুত্রদিগকে খাওয়াইলেন, ঝি সেদিন বাটীতে ছিল না, সুতরাং গৃহিনী অবশিষ্ট অন্ন কিছু ভৃত্যের জন্য রাখিয়া, উদরসাৎ করিয়া শয়নাগারে চলিয়া গেলেন। সরলাও কিয়ৎ কাল পরে শয়ন করিতে চলিল। তখন রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকা।

সরলা শয্যায় শয়ন করিল। প্রত্যহ তাহাকে গৃহিনীর পুত্রগুলিকে লইয়া শয়ন করিতে হইত কিন্তু আজ গৃহিনী পূর্ব্বেই দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছেন, সুতরাং হতভাগিণী অন্যঘরে গিয়া শয়ন করিল ঘর নিস্তব্ধ, একা সেই ঘরে শয়ন করিয়া সমস্ত জীবনের অতীত কাহিনীগুলি একে একে ভাবিতে লাগিল। সহসা একটী বাতাসে গৃহস্থিত প্রদীপ নিবিয়া গেল। অন্ধকারে তাহার চিন্তা আরো গাঢ় হইয়া আসিল।

ঘড়িতে টং করিয়া একটা বাজিল। সরলা বিছানা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া পদচালনা করিতে করিতে

নিকট উপস্থিত হইল। দুইহস্তে সে দরজা খুলিল, খুলিতেই একবার নৈশ প্রকৃতির নিশ্চল মূর্তি তাহার নয়ন সম্মুখে পতিত হইল। ধীরে ধীরে সরলা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল। ধীরেপদ বিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া সে সদর দরজা খুলিল।

কৃষ্ণপক্ষীয় নিশি। গভীর অন্ধকার। সরলা সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিল। নিকটেই একটা শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। সরলার হৃদয় সহসা একটু কম্পিত হইল। পরক্ষণেই আবার হৃদয়ে বল পাইয়া অভাগিনী চলিল। চতুর্দ্দিকে নিরবচ্ছিন্ন নীরন্ধ্র অন্ধকার।

সেই অন্ধকারে আকাশস্থিত নক্ষত্র, বৃক্ষশাখা সন্নিকটস্থ খদ্যোতকুল ক্ষীণ আলোকে অন্ধকারের গভীরতা প্রকটিত করিতেছিল। হতভাগিনী অতিক্ষীণ কণ্ঠে কহিল "তুমি এলেনা —আজ তোমার কাছে যাব।"

পরদিন মুকুর্য্যে মহাশয় গৃহে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন "গিন্নি তুমি থাক, সুখে সংসার কর; আমি চল্লুম। বৌমাকে পাই ফিরে আসব, না পাই আসব না, আর যদি একটা গলার দড়ি জোটে, তাহলে আমায় একবার খপর দিও।"

সে দিন বৈকালে মুকুর্য্যে মহাশয়কে আর গ্রামে দেখা গেল না।

৭

মুকুয্যে মশায় রাত্রি দশটার ট্রেনে বৈদ্যনাথ যাত্রা করিলেন, তিনি বুঝিলেন সরলার বৈদ্যনাথে যাওয়াই সম্ভব। সমস্ত রাত্রি ট্রেনে অতিবাহিত করিয়া প্রাতে তিনি ষ্টেশনে নামিলেন। ষ্টেশনে নামিয়াই দেখিলেন একদিকে জনতা; তৎক্ষণাৎ তাহার কারণ জানিবার জন্য তিনি সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় দুই হাত তুলিয়া কুলিদিগকে ডাকিতেছেন ও চিৎকার করিয়া বলিতেছেন "এ আদমী কো হাঁসপাতালমে লে যাও" মুকুয্যে মশায় নিকটে আসিয়া দেখিলেন, অবসন্নদেহে সরলা ভূমিতে পড়িয়া আছে। মুকুয্যে মশায়ের চক্ষে অশ্রু দেখ দিল, তিনি কহিলেন "মা কেন তুমি চলে এলে। সরলা একবার চক্ষু চাহিয়া আবার চক্ষু মুদিল।

মুকুয্যে মশায় তৎক্ষণাৎ একটী গাড়ী ভাড়া করিলেন। সরলাকে স্থানান্তরিত করা হইল।

সে দিন কাটিল, রাত্রি মাঠের উপর একটি জীর্ণ বঙ্গালায় অতিবাহিত হইল। সরলার জ্বর কমিল না, সন্ধ্যাকাল হইতে সে প্রলাপ বকিতে লাগিল। প্রলাপের ঘোরে তাহার মুখে এককথা "তোমাকে এসেও পেলেম না কেন ?"

৮

রাত্রিকাল ; নরেন্দ্র একটী প্রান্তরে দূর্ব্বাদলের উপর বসিয়া আছেন। সে দিন শুক্লপক্ষীয় নবমী বিস্তৃর্ণ প্রান্তর। দূরে মসৃণপল্লব বৃক্ষগুলির উপর দিয়া জ্যোৎস্নার তরঙ্গ ছুটিয়াছে। নির্ম্মল আকাশ এখানি চিত্রপটের মত প্রসারিত।

নরেন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন, গভীর চিন্তা আজ তাহাকে ব্যাকুল করিয়াছে। সরলার পত্রে জানিলেন-তাহার একখানি ও পত্র সরলার হস্তগত হয় নাই। ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সরলার নিকট হইতে তিনি প্রায়ই পত্র পাইতেন কিন্তু প্রায় দুইসপ্তাহ হইল তিনি আর পত্র পান না।

কুচিন্তাই অগ্রে আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। নরেন্দ্রনাথ যতচিন্তা করিতে লাগিলেন কুচিন্তা ততই ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ রজনী, নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকাশে তাহার অন্তরের গভীর নির্জ্জনতা প্রকৃতির নির্জ্জনতার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

গুমট্ ভাঙিয়া হু হু করিয়া একটা বাতাস বহিয়া গেল। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষিপ্ত মেঘ খণ্ড আকাশের চতুর্দ্দিক হইতে একত্রে মিশিল, নক্ষত্র নিবিল, চন্দ্রের অম্লান উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে প্রান্তর হইতে লুপ্ত হইল। আঁধার ঘনাইয়া আসিল।

নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে উঠিলেন। তখন তাহার হস্তপদ শিথিল; এই সময় জলকনার সহিত একটা ঠাণ্ডা বাতাস নরেন্দ্রনাথের গাত্রে লাগিল। সঙ্গে২ তিনি শুনিলেন কে যেন গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসে মর্ম্মবেদনা জানাইয়া বলিতেছে "এসেও তোমায় পেলেম না।" চমকিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ পশ্চাতে চাহিল। দেখিল আকাশস্থিত মেঘ গভীর অন্ধকারের সহিত বৃক্ষরাজিতে মিশিয়া একটা নিবিড় কালিমা জমাইয়া তুলিয়াছে। নরেন্দ্রনাথের অন্তর কাঁপিতে লাগিল, স্খলিত পদে তিনি ভুমিতে পতিত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে নরেন্দ্রনাথ উঠিল। তখন তাহার বোধ হইতেছিল যেন চতুর্দ্দিক ঘূর্ণমান, ধীরে ধীরে স্খলিত পদে গৃহসমীপে আসিয়া সে দেখিল ডাক্তারের পাঠাগারে আলোক জ্বলিতেছে। ডাক্তার মহাশয় তখনো পাঠ করিতেছেন। নিকটে টেবিলের উপর এক একখানি গন্ধমাদন সদৃশ পুস্তক, বোধ হয় তিনি কি একটা গুরুতর বিষয় অন্বেষণ করিতেছিলেন নরেন্দ্রনাথ ঘরে প্রবেশ করিতেই ডাক্তার মহাশয় বলিলেন "বলি নরেন বাবু গিয়েছিলেন কোথায়। এই রাত্রে বুঝি কবি মহাশয়েরা বাহিরে পদচারণা করেন। দেখবেন এরকম কোরে যেন কোন ব্যায়রাম না হয়।

নরেন্দ্রনাথ কহিল "ডাক্তার মশায়। আমি কাল সকালে একবার বাড়ী যাব, মনটা বড় খারাপ।" এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথ ডাক্তার মহাশয়কে তাঁহার চিন্তার কারণ সমস্ত বিবৃত করিল। শুনিয়া ডাক্তার মহাশয় কহিলেন বেশ, তা আপনি যাবেন; এ রকম ব্যাপার! আপনার একবার যাওয়া উচিত। আর আসবার সময় এবার আপনি আপনার স্ত্রীকে ও সঙ্গে কোরে নিয়ে আসবেন। তিনিও না হয় অনুগ্রহ কোরে আমার বাড়ীতেই থাকলেন।"

এই বলিয়া ডাক্তার আবার পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ কহিল "ডাক্তার মশায় আপনি ঘুমোতে যান, অনেক রাত হয়েছে" ডাক্তার মহাশয় উত্তর করিলেন "নরেন বাবু আপনি এইখানে শুনুন। একটি রোগিনী কি রোগে মারা যাচ্ছে, আমি তা স্থির কোরতে পারিনি আমাকে আজ রাত্রে একটু খাটতে হবে।"

এই সময় বাহিরে কে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল "ডাক্তার ডাক্তার মশায়"। ডাক্তার মহাশয় উত্তর করিলেন "কেগো"। শব্দ হইল "আসুন, দয়া কোরে একবার আসুন, রোগিনী যায় যায়।" ডাক্তার মহাশয় নরেন্দ্রনাথকে কহিলেন আপনি যদি একবার অনুগ্রহ কোরে আমার সঙ্গে আসেন, কেননা একটা চাকরও জেগে

নেই। তাদের জাগালে এই ঠাণ্ডা বাতাস গেলে কোন অসুখ হতে পারে। আপনি জেগে আছেন? আপনিই একবার আসুন।"

নরেন্দ্রনাথ সম্মত হইল। কেহ জাগিয়াছিল না বলিয়া ডাক্তার মহাশয়ের শকট সজ্জিত হইলনা—দুইজনে পদব্রজে বহির্গত হইলেন। বাহিরে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন একটী বৃদ্ধ লোক। লোকটীর পদদ্বয় তখন ও কম্পিত হইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া ডাক্তার মহাশয় কহিলেন "আপনি কাঁপচেন কেন?"

বৃদ্ধ উত্তর করিল "শীত কোরছে।"

ডাক্তার মহাশয় তাহার নাড়ী টিপিয়া কহিলেন আপনার জ্বর হোয়েছে, আমার কাঁধ ধোরে চলুন। ডাক্তারের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া লোকটি অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন একপসলা বৃষ্ট হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী তখনো চমকিতেছিল। তখনও শিক্তদ্রুম রাজির ভিতর দিয়া শীতল বায়ু বহিতেছিল। অন্ধকার মগ্নবিশাল প্রান্তর, বক্রগামিনী তটিনীর সহিত বিদ্যুদালোকে মাঝে মাঝে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল।

তিনজনে, কিয়ৎক্ষণ পরে একটি বাঙ্গালার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বাঙ্গালার ভিতর হইতে ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখা দিল।

তখন বৃষ্টি আবার পিট পিট করিয়া আরম্ভ হইয়াছে, বৃক্ষমর্ম্মরধ্বনি আবার শুনা যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ পত্রচ্যুত জলবিন্দু তাহাদিগের গাত্রে পড়িতে লাগিল। তিনজনে দ্বার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন।

সহসা আকাশে বিদ্যুত চমকিল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অশনিসম্পাতে দিগন্ত কম্পিত হইল। তারপর নিস্তব্ধতা প্রকাশ পাইল। সকলে শুনিল কে যেন অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিতেছে "এসেও তোমাকে দেখতে পেলুম না।"

"কেমন আছ মা" বলিয়া বৃদ্ধ লোকটি তীরবেগে গৃহে প্রবেশ করিল। ডাক্তারের কথায় নরেন্দ্রনাথ বাহিরে বসিলেন, কিন্তু তাঁহার মন তাহাকে ঘরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল।

৯

যতক্ষণ ডাক্তার মহাশয় রোগিণীকে পরীক্ষা করিতেছিলেন ততক্ষণ নরেন্দ্রনাথ বাহিরে বসিয়া অবনতমুখে কর্দ্দমময় পথপানে, কখনো বিদ্যুদ্দীপ্ত মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিতেছিলেন, কখনো বা ক্ষীণকণ্ঠের আর একটী কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইতেছিলেন।

ডাক্তার বাহিরে আসিয়া নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন "নরেনবাবু সব হ'ল তবে আমার প্রাপ্য পেলুম না। লোকটারও জ্বর, কি কোরেই বা বলি।" নরেন্দ্রনাথ কহিলেন 'ডাক্তার মশায় এই দীনদুঃখীদের কাচ থেকে কিছু নেওয়া ভাল কি?

ডাক্তার।—দেখুন নরেন বাবু, আমি সামান্য অর্থ গ্রাহ্য করিনা। আমি বিনা অর্থে সকল রোগীকে ঔষধ দিতে পারি। ডাক্তারকে অর্থ না দিলে লোকে অধিক অর্থের জন্য ব্যস্ত হবে না, তার পরিণামে অনেক লোক অলস হয়ে পোড়বে। এই জন্যই আমি ব্যস্ত। তবে এদের কাছ হতে আমি কিছু নেব না কারণ এরা বিপদাপন্ন। আপনি একটু ঘরে

গিয়ে বস্থন। আমি বাড়ী হইতে ঔষধ নিয়ে আসি।

ডাক্তার মশায় আলোক লইয়া চলিয়া-গেলেন, নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিল।

গৃহের মধ্যে একটী খাট, তাহার উপর জীর্ণ শর্য্যা, সেই শর্য্যার উপর শীর্ণ রোগক্লিষ্টা রমনী বর্ষণান্তে ছিন্ন ভিন্ন মেঘ সমূহের মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি অচঞ্চলা সৌদামিনীর ন্যায় শায়িতা। নরেন্দ্রনাথ রোগিনীর পার্শ্বে দাড়াইলেন। তাঁহার নয়ন প্রান্ত হইতে হয়ত তখন একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়াছিল।

রোগিনী বিকারের ঘোরে কথা কহিল "তুমি বল্লেছিলে এখানে এলে আমি তোমার দেখা পাব, কিন্তু কৈ? এখানে এসেও তোমার দেখা পেলাম নাত।

নরেন্দ্রনাথ রোগিনীর মুখপানে আবার চাহিল। তারপর গৃহতল লুণ্ঠিত বৃদ্ধের মুখপানে চাহিল। নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে রোগিনীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া বাষ্পজড়িত কণ্ঠে কহিল "সরলা এই যে আমি এসেছি।" নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

রোগিনী নেত্র উন্মীলন করিল। অনিমেষ নয়নে নরেন্দ্রনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিল। রোগিনীর গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

রোগিণীর নেত্রদ্বয় বহুক্ষণ একভাবে রহিল, তারপর চক্ষু জ্যোতিহীন হইল। একটি কালিমার ছায়া তাহার মুখমণ্ডল আবৃত করিল। নরেন্দ্রনাথেরও মস্তক লুটাইয়া পড়িল।

অল্পকাল পরে ডাক্তার মহাশয় ঘরে প্রবেশ করিয়া মূৰ্চ্ছিত নরেন্দ্রনাথের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া কহিলেন "রোগিণীর আত্মীয় লোকে আপনাকে বোধ হচ্ছে; রোগিণী আপনার জন্যই পীড়িত; এরূপ অবস্থায় হঠাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাটা আপনার ভাল হয় নাই।

নরেন্দ্রনাথ একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন?

প্রভাতে নদীকুলবর্ত্তী শ্মশান সন্নিকটে শব্দ হইল "বল হরি হরিবোল।" নিস্তব্ধ শ্মশানে প্রতিধ্বনি হইল "বল হরি হরিবোল।"

অবিলম্বে তিনজন পুরুষ একটী খাট স্কন্ধে করিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইল। এই তিনজন আমাদের ডাক্তার, নরেন্দ্রনাথ ও পূর্ব্বপরিচিত বৃদ্ধ। নরেন্দ্রনাথ শবসন্নিকটে উপবেশন করিলেন; বৃদ্ধ ও ডাক্তার মহাশয় দুইজনে কাষ্ঠান্বেষণে চলিয়া গেলেন।

নরেন্দ্রনাথ একা পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সরলার মৃত্যুবিকৃত নিস্পন্দ মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। প্রভাত শিশিরসিক্ত মরুত হিল্লোলে সরলার অবিন্যস্ত কেশ রাশি কম্পিত হইতে লাগিল। প্রভাতা লোকে সরলার নিষ্প্রভা দেহলতা মূৰ্ত্তিমতী বিষাদস্মৃতির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল।

দুঃখের সময় সুখের ছবিগুলি পরিস্ফুট হয়। নরেন্দ্রনাথ তাই আজ অচেতন প্রায় বসিয়া আছেন। নির্জ্জন তটিনীতরঙ্গ-মুখরিত শ্মশানে নরেন্দ্রনাথ তাই আজ জীবনের অতীত সুখস্মৃতিগুলিকে একে একে মানসে স্থান দিতেছেন। সরলার কালিমাজড়িত মুখখানি দেখিয়া আজ তাঁহার স্মিতাননা, চঞ্চলা সরলাকে

মনে পড়িতেছে। চিরবিচ্ছেদের সময় আজ তাহার অতীত ঘনীভূত প্রেমরাশি, অখণ্ড স্নেহরজ্জু, অনন্ত শান্তি, অনন্ত সুখ একে একে তাহাকে জর্জ্জরিত করিতেছে।

অবিলম্বে ডাক্তার মহাশয় কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া নরেন্দ্রনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ নরেন্দ্রনাথকে কহিলেন "স্থির হও বাবা! যা হ'বার তা হয়েছে। তা না হলে বৃদ্ধ আমি বাঁচিলাম কেন? নরেন্দ্রনাথ নিরুত্তর।

তখনি চিতা প্রস্তুত হইল?

যেমন তটিনী ধীরে ধীরে সুতানে বহিতেছিল, যেমন বৃক্ষশাখাবাসী বিহঙ্গেরা মধুর স্বরে জগৎ জাগাইয়া তুলিতেছিল, তখন শ্মশান প্রাঙ্গনাহিত সহস্রজিহ্ব বহ্নি গুরুগম্ভীর শব্দে অনন্যমনে সরলার দেহলতা গ্রাস করিতে লাগিল।

শবদাহনান্তে চিতা নির্ব্বাপিত করিয়া সকলে স্নানার্থ তটিনীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, স্নানান্তে তিনজনে নিকটস্থ একটী বৃক্ষ মূলে উপবেশন করিলেন। মন্দপবনোদ্ভূত, ক্ষুদ্রোর্ম্মি সমূহ পদতলস্থিত শিলাখণ্ডে আছাড়িয়া পড়িতে লাগিল।

বহুক্ষণ পর নরেন্দ্রনাথ জড়িত কণ্ঠে কহিলেন "মুখুয্যে মশায় আপনি ঘরে যান। ডাক্তার! ভাই তুমি অনেক উপকার কোরেছ, দাদা আমি প্রত্যুপকার কোরতে পারিলাম না ভাই আর একটী উপকার কর আমাকে বিদায় দাও।

ডাক্তার কহিলেন "নরেন বাবু! আপনি এত অধৈর্য্য হোচ্চেন কেন? মনে করুন স্ত্রী আপনার স্বর্গে। আপনি তো স্বর্গ বিশ্বাস করেন।"

নরেন্দ্রনাথ নিরুত্তর হইলেন।

১০

অনেক কাল কাটিয়া গিয়াছে। অনেক ক্রোধহিংসার স্মৃতি লুপ্ত হইয়াছে। অনেকে পৃথিবীতে আসিয়াছে, অনেকে এখান হইতে চিরবিদায়ও গ্রহণ করিয়াছে।

বৈদ্যনাথে একজন সংন্যাসী আসিয়াছেন তাঁহর সমস্ত শরীরে স্বর্গীয় আভা লাগিয়াছে। তিনি চুপ করিয়া একটি গাছের তলায় বসিয়া আছেন। শুনা যায় স্থানটি আগে শ্মশান ভূমি ছিল।

সন্ন্যাসী চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, কাছে কেহ নাই। এমন সময় একখানি গাড়ী রাস্তার উপর দিয়া চলিতেছিল। গাড়ীটি সহসা থামিল। ভিতর হইতে একজন বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বাহির হইল। সন্ন্যাসী সেদিকে চাহিলেন না।

বৃদ্ধ বৈদ্যনাথের ডাক্তার। এখন আর তিনি "কলে" যান না। তাঁহার অনেক বয়স হইয়াছে। তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন, সন্ন্যাসীকে ভাল করিয়া দেখিতে তাঁহার হটাৎ কেমন একটা আগ্রহ হইয়াছে।

ডাক্তার সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিল, তারপর তাঁহার কাছে বসিল, সন্ন্যাসীও ডাক্তারের মুখের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন।

ডাক্তার বলিলেন "নরেন বাবু, এ বেশে কি সুখ, আসুন আমার কাছে, এ কঠোর পথ ত্যাগ করুণ।

সন্ন্যাসী বলিলেন "ডাক্তার এ পথ কঠোর নয়, এপথে বড় আনন্দ।

"এখনও স্ত্রীর চিন্তা ছাড়তে না পেরে আপনি সেই শ্মশানে এসে বসেছেন।

সন্ন্যাসী—কহিলেন "তাই এতেই আনন্দ—দুঃখ আমার সাধের জিনিস।

তাহার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর গাড়ীতে উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

---

## রামের প্রতি সীতা।

—:০:—

১

তোমা বিনা ওহে নাথ! করুনা-নিধান!
স্বরগও মম কাছে নরক সমান॥
মাতা পিতা ভ্রাতাগণ,
শ্বশ্রু আদি গুরুজন,
নারীর সহায় বটে সুশীল তনয়।
কিন্তু পতিসম ভবে কেহ নাহি হয়॥
রাজগৃহ পরিজন,
যত কিছু রাজ্যধন,
পতিবিনা সবই হয় শোকের আগার।
পতি প্রাণা নারী কাছে সংসার মাকার॥
ভোগ হয় রোগ তার,
বেশভূষা মহাভার,
সংসার তাহার হয়
যেন ভীম যমালয়;
তোমা বিনা মম নাথ! করুণা সাগর।
কেবা আছে সুখদাতা অবনী ভিতর।

২

প্রাণ বিনা কলেবর,
জল বিনা সরোবর,
যথা নাহি শোভা পায়, নারীর তেমন।
পতি বিনা শোভা ভবে না হয় কখন॥
কয় মোরে কর সাথ;
বনের যে দুখ নাথ!
কহিলে আমারে তুমি করুণা নিধান!
তুচ্ছ আমি করি তারে,
তব চন্দ্র মুখ হেরে
হইবে আমার তাহা সুখের সমান।
কানন নগর হবে;
বনমৃগ পাখী সবে
করিবে আনন্দ দান কুটুম্বের মত।
পর্ণ কুটি দিবে সুখ স্বরগের যত।
রেশমী বসন সম হবে বৃক্ষ-ছাল।
পরম আনন্দে বনে কাটাইব কাল॥
লও লও লও নাথ! লও মোরে সাথে
নাহি নাহি নাহি মোর ভয় নাহি তাতে।

৩

কাননের দেব দেবী
পরম আনন্দে সেবি,
শ্বশুর শাশুড়ি মত, করুণা-নিধান!
বনে সুখ পাব নাথ! স্বরগ সমান॥
থাকিলে তোমার সাথ,
কামদেব-শয্যা মত,
হইবে সুখদ নাথ! হইবে নিশ্চয়।
কাননেতে শয্যা মম কুশা-পত্রময়॥
কন্দমূল ফলে যত
আহার, অমৃত মত
পতির চরণ হেরি হইবে আমার।
তাতে তুচ্ছ হবে নাথ! খাদ্য অযোধ্যার॥

৪

দেখাইলে দুখ ভয়
বনবাসে কৃপাময়!

জানা মত; কিন্তু পতি-বিয়োগের মত।
নহে তাহা নহে নাথ! ভয়াবহ এত॥
লও লও লও নাথ! লও মোরে সাথে।
সহি নহি গুণাধার! ভীত নহি তাতে॥
ছেড়না আমায় নাথ!
লও মোরে লও সাথে,
শুন এ মিনতি মম করুণা নিধান!
আমি কি বলিব আর?
অন্তর্যামী গুণাধার!
যদি বা রাখিতে চাও এ দাসী-পরাণ
সঙ্গে তবে নিয়ে কর বনেতে প্রয়াণ॥

৫

করিব চরণ সেবা,
থাকি সাথে রাত্রি দিবা,
চলিয়া হইলে শ্রান্ত,
বসাইয়া প্রাণকান্ত!
ব্যজন করিব আমি গাছের ছায়ায়।
আঁচলে মুছায়ে দিব ঘর্ম্মসিক্ত কায়॥
কাননে পাখীর গানে
দোঁহে শীতলিয়া প্রাণে,
সুখ আলাপনে নাথ! কাটাব সময়
ছাড়িয়া যেওনা মোরে ওহে কৃপাময়।

৬

যদি ইচ্ছা যেতে ছাড়ি,
এ দাসীরে বধ করি,
শব দেখে শুভযাত্রা কর প্রাণধন।
সুখে যেন কাটে কাল, স্বর্গ হয় বন।
বধহ কি লও সাথ,
ছুটার একটা নাথ।
করে যাও, যাহা আজ লয় তব মন।
বিরহ সহিতে যেন না হয় কখন॥

শ্রীজগবন্ধু চৌধুরী।

# জাহাঙ্গীর বাদশাহের গ্রীষ্মাবাস।

ভারতের মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর বাদশাহ ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নির্জ্জন ও নীরব সৌন্দর্য্যের মধ্যে, রাজধানী শ্রীনগর হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে "সেলিমার বাগ" নামে একটি সুন্দর গ্রীষ্মাবাস প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেলিমার বাগের বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ Wilsons সাহেব কাশ্মীর ভ্রমণ কালে তাঁহার the abode of snow নামক প্রসিদ্ধ ভ্রমণ বৃত্তান্ত পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহ করিলাম।

কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম ও চিত্তাকর্ষক। নগরের সর্ব্বত্রই গম্ভীর মূর্ত্তি, সুধাধবল শৈল দণ্ডায়মান ও শ্যামল সৌন্দর্য্য বেষ্টিত এক অতুলনীয় চিত্র। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত, ইহার উপত্যকা, গিরিমালা, ও রজত শুভ্র তুষার রাশি। উপত্যকাগুলি বড়ই সুন্দর, দূর প্রসারিত শ্যাম শষ্পাস্তৃত ও মধ্যে মধ্যে পার্ব্বত্য তরু "চেনার" ও বকম বৃক্ষে শোভিত ও সমাচ্ছন্ন; কোথাও স্বচ্ছগিরি নির্ঝরিনী অলস ভাবে বহিয়া চলিয়াছে, কোথাও আরণ্য কুসুমে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিজন প্রান্তরে সৌন্দর্য্যের রাশি ফুটাইয়া প্রকৃতই ভূ-স্বর্গের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। কাশ্মীর রাজধানী শ্রীনগর হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে সম্রাটের গ্রীষ্মাবাস "সেলিমার বাগ"। বাগানের দুইদিকে দুইটি ক্ষুদ্র শৈল বিরাজমান। শৈল গাত্র হইতে একটী নির্ঝরিনী গলিত রজত

তেরঞ্জায় পতিত হইতেছে, অবিশ্রান্ত কলতান তুলিয়া বাগানের সজীবতা ঘোষণা করিতেছে। চারিদিকে 'চেনার' ও অন্যান্য পার্ব্বত্য প্রদেশীয় বৃক্ষ চন্দ্রাতপের ন্যায় তাহাদের শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বাগানটিকে আতপ তাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। একটি সুন্দর ও বৃহৎ পপ্লার বৃক্ষ শ্যামল শাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। তন্তলে নানারূপ স্বভাব জাত পুষ্প বৃক্ষ ও কয়েকটী সুন্দর শ্বেত মর্ম্মরের বেদী, বেদীর সম্মুখে নিঝরিনীর জল ঝর্ঝর করিয়া পড়িয়া, উৎসের ন্যায় মুক্তার শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। বিলাসী ও শান্তিপ্রিয় বাদশাহ গ্রীষ্মের মধুর প্রদোষে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী নুরজাহানকে লইয়া বেদীতে উপবেশন করিতেন এবং রূপোন্মত্ত ও মোহমুগ্ধ বাদসাহ মনপ্রাণ ভরিয়া রূপের-পসরা নুরজাহানের রূপরাশির সুধা পান করিতেন। নিকটে অতি সুন্দর সৌধ, চারিদিকে বৃক্ষ বিথীকার দ্বারা শোভিত ও আবৃত রহিয়াছে। শান্তি ও আনন্দ প্রয়াসী বাদশাহ দেখিয়া শুনিয়া অতি সুন্দর ও নির্জ্জন স্থানে গ্রীষ্মাবাস প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান "সেলিমার বাগের" বর্ত্তমান অবস্থা বড়ই শোচনীয়। প্রাচীন সকল কীর্ত্তি গুলিরই একদশা। হায়! এহেন কীর্ত্তি গুলি সংস্কার করিতে আমাদের প্রবৃত্তিই জন্মে না। বাদশাহের সে বিলাস বৈভব পুরী, সে বিচিত্র সৌধ আজ কালের কুঠারাঘাতে ভগ্নদশা প্রাপ্ত! যদি কোন ইংরাজ রাজপুরুষ কর্ত্তৃক "সেলিমার বাগ" প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে কি তাহার আজ ঐ দশা হইত? সেলিমার বাগের সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই, কি মনোহর নীরব সৌন্দর্য্য! সে নয়ন মনোমোহন প্রাণারাম দৃশ্যের মধ্যে প্রকৃতির সে মুনিমনোহর শোভার কি যে নীরব সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য! সেলিমার বাগের তোরণ গুলির মধ্যে কয়েকটীতে একদল স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিয়াছে, সেখানে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঘণ্টাধ্বনী ও শঙ্খধ্বনীতে চতুর্দিক মুখরিত করে; ইহাই বর্ত্তমান "সেলিমার বাগানের" অবস্থা।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের কথা প্রসঙ্গে তাঁহার চরিত্র বিষয়ে দুই একটী কথা বলা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবেক না বিবেচনায় লেখা যাইতেছে।—

বাদশাহ অত্যন্ত অদ্ভুত অথচ প্রাঞ্জল স্বভাবের লোক ছিলেন। একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, তিনি নিজে সুরা পান করিতেন কিন্তু অন্য সুরাপায়ীদিগকে ঘৃণা করিতেনও শাস্তি দিতেন। বাদশাহের পুত্র খসরু বিদ্রোহী হওয়ার পরে যখন বিদ্রোহের শান্তি হইয়াছিল। তিনি তখন পুত্রকে কারারুদ্ধ ও অন্যান্য বিদ্রোহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দিগকে শূলে চড়াইয়া বধ করিয়া নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।" চারিদিকে রাজনৈতিক গোলোযোগে বিব্রত হইয়া বাদশাহ শান্তির আশায় সুদূর কাশ্মীরের নিভৃত ও মনোরঞ্জন স্থানে গ্রীষ্মাবাস প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের চরিত্র বর্ণন উপলক্ষে সুরা-

পানের বিষয় উল্লেখ না করিলে তাঁহার চরিত্রের একদিক অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। তাঁহার সুরাসক্ত হওয়ার বিষয়ে তিনি তাঁহার স্বরচিত জীবন বৃত্তান্তের একস্থানে লিখিয়াছেন, "একদা কয়েকটী বন্ধুসহ মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া বনে বনে শীকার অন্বেষণে ঘুরিয়া আমি বড়ই শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ি, সে সময় আমি এতদূর পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম যে, আমি আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেছিলাম না; তাহা দেখিয়া আমার একজন পারিষদ একপেয়ালা সুস্বাদু সুরা আনিয়া তাহা পান করিতে বলিলেন ও বলিলেন ইহা পান করিলে মন প্রফুল্ল ও হৃদয়ে বল পাইবেন। আমার তখন যৌবনোন্মুখ অবস্থা, আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা পানকরিয়া ফেলিলাম। সুরা পান করিবার পর আমি খুব প্রফুল্লিত ও হৃদয়ে বল পাইয়াছিলাম। সেই হইতে আমি সুরাসক্ত হইয়া পড়ি।"

বাদশাহ যেরূপ রাজনীতি বিশারদ ছিলেন তিনি সেইরূপ আনন্দ ও শান্তি প্রয়াসী ছিলেন। "সেলিমার বাগ" আবাসে অবস্থান কালীন তিনি সে স্থানের প্রতি এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি সে সময় বলিয়াছিলেন যে, এখন আমি কাশ্মীর ব্যতীত সমস্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।

নানারূপ শৈলশ্রেণী, নির্ঝরিনীও স্থানে স্থানে পলিত রজত-শুভ্র স্রোতস্বিনী আঁকিয়া বাঁকিয়া পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতেছে এবং স্বভাবজাত আরণ্য পুষ্প অতি সদগন্ধ যুক্ত ও মনোমুগ্ধকর, এই সকল পুষ্পের কেশর হইতেই জাফ্রান প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু নব প্রস্ফুটিত কুঙ্কুমের গন্ধ অত্যন্ত তীব্র। বাদশাহ তাঁহার স্বরচিত জীবন বৃত্তান্তের একস্থানে কুঙ্কুমের বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন "আমার পারিষদবর্গের সকলেরই কুঙ্কুমের গন্ধে মাথা ধরিয়াছিল এবং আমি ঐ গন্ধে মত্তের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য সকলেই ঐ পুষ্পের তীব্র গন্ধে বিব্রত হইয়া পড়িতেন, বেগম নুরজাহান কিন্তু কুঙ্কুমের গন্ধ বড়ই ভাল বাসিতেন, তিনি ঐ পুষ্পের দ্বারা তাঁহার কবরী শোভিত করিতেন।

জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রিয়তমা বেগমকেবড়ই ভাল বাসিতেন, নুরজাহানের প্রজ্জ্বলন্ত জ্যোতিতে তিনি সর্ব্বদা মুগ্ধপ্রায় হইয়া থাকিতেন। বাদশাহ সর্ব্বদা বেগমকে সঙ্গে রাখিতেন তাহার মোহিনী শক্তিতে একান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। একারণ অনেক লেখক তাঁহার উপর দোষারোপ করিতেও কুণ্ঠীত হয়েন না। কিন্তু ইহাতে তিনি তাঁহাদের পুরুষ পরম্পরাগত কলঙ্কের দায় হইতে কতকটা মুক্ত ছিলেন। তিনি নুরজাহানকে প্রাণপেক্ষা ভাল বাসিতেন বলিয়া তিনি অধিক স্ত্রীতে অনুরক্ত ছিলেন না, নুরজাহান ও বীররমনী, গরীয়সী ও বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। যৎকালে মহবৎখাঁ বিদ্রোহ হইয়া বাদশাহকে বন্দী করিয়াছিলেন, সে সময় তেজস্বিনী বীর রমনী নিজেই রণসাজে সজ্জিত হইয়া বাদশাহকে উদ্ধার করিবার জন্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ও পরে তিনিই কৌশলে বাদশাহকে বিদ্রোহী দিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

যাহা হউক কাশ্মীরের অতি নির্জ্জন ও স্বভাব সুন্দর প্রদেশে সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রীত্যা বাস "সেলিমার বাগ" কালের কুঠারাঘাতে লুপ্ত প্রায় হইলেও আজিও অতীত স্মৃতি ক্ষীণভাবে বহন করিতেছে।

শ্রীলালগোপাল মিত্র।

## অন্ধকার।

—:০:—

জীবনের কূলে, স্বপনের কোলে, অরণ্যের ছায়াতলে—পূর্ণিমার পরে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে নিমীলিত-নয়ন-সীমায় প্রতি নিয়ত ভাসিতেছে —অন্ধকার! বড় ভাবিয়াও দেখি না, একি? নেত্রপল্লব যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়, তখন কি আমরা সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিহীন হই?—না তাহা হইনা; তখনও দেখিতে পাই এবং যাহা দেখি তাহা এই বিরাট বিপুল, ঘনীভূত অন্ধকার। কেন দেখি—কি করিয়া দেখি? নয়ন মুদ্রিত করিলে যদি দেখাই না যায়, তবে এ অন্ধকার দেখিবার শক্তি আমাদিগকে কে দেয়? বাহ্যদৃষ্টি ইহা অবশ্যই নহে, কিন্তু অন্তদৃষ্টি।

ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ বুঝি অন্ধকার ব্যতীত হইতে পারে না একাগ্রতা বুঝি অন্ধকার নহিলে লাভ করা যায় না, আলোক বুঝি এই অন্ধকার না থাকিলে উজ্জ্বল হইতে পারেনা, নহিলে ইষ্টদেবতার আরাধনাকালে নেত্রপল্লব নিমীলিত করিতে হয় কেন? ধ্যানের তপস্যা নিমীলিত নয়নে কেন? যোগীর সাধনা মুদ্রিত চক্ষে কেন? সংক্ষেপে, বাহ্যদৃষ্টি বহিঃ প্রকৃতির বিভিন্ন চিত্রাবলীতে আমাদের মন চঞ্চল করিয়া দেয় এবং এইরূপে চিত্তের বিঘ্ন জন্মায় কিন্তু অন্ধকার তাহা না করিয়া বরং আমাদের একাগ্রতার সহায়তা করে। সে যাহাই হউক, এই অন্ধকার কে? এই বিরাট গাম্ভীর্য্য—গভীর নিস্তব্ধতা—এই মৌন ইঙ্গিত আমাদিগকে কি দেখায়? জগতের বুকে আলোকও আছে, অন্ধকারও আছে—পূর্ণিমাও আছে, অমানিশাও আছে, তবে আমরা পূর্ণিমার মহিমা কীর্ত্তনে আমাদের কাব্য ছাইয়া ফেলি আর অন্ধকারকে অজ্ঞানতার সহিত তুলনা করিয়া পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিই কেন? প্রাণীজগতে অন্ধকারের এ দুর্দ্দশা যে জন্যই হউক, আমরা আজ তাহাকে অন্য চক্ষে দেখিব: —

সূর্য্যালোক বড় তীব্র - সূর্য্যালোক সুখ, অন্ধকার বড় নম্র—অন্ধকার দুঃখের ছবি। জগত সূর্য্য হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া সে 'সৌর জগত' এবং 'সৌর জগত' বলিয়া সে সূর্য্যের নিকট অবশ্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু লোকতঃ ধর্ম্মতঃ অন্ধকারের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাধ্য না হইলেও, সৌর জগত যে তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না, এই দৃশ্যের ভিতরই অন্ধকারের মহত্ব এবং ইহাই তাহার স্নেহ ও অজ্ঞ-নিত শক্তির পরিচায়ক। কিরূপে?—তাহা বুঝাইবার জন্য একটা গল্পের অবতরণা করা যাক:—

অনবরত ঘূর্ণায়মান তেজোদ্দীপ্ত অগ্নিগোলকের বুক হইতে খসিয়া যেদিন জগত বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং পিতৃ-বিয়োগ কাতরা কন্যা

ধরিত্রীর প্রতি না ফিরিয়া প্রবল প্রতাপান্বিত উপগ্রহদের সগর্ব্বে আপন গন্তব্যপথে ছুটিয়া চলিলেন, সেই দিন ধরণী অন্ধকারের কোলে প্রথম স্থান পাইয়াছিল—সেই অসহায় অবস্থায় অন্ধকারের নিকটই শুধু সান্ত্বনা পাইয়াছিল।' সর্ব্ব প্রথম বিদেশে অন্ধকারকে সখীরূপে পাইয়া ধরণীর তপ্তবক্ষ জুড়াইয়াছিল বলিয়াই সে অন্ধকারকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না। এই অন্ধকার কে, এখন তাহারই পরিচয় দিবঃ—

'আলোকের অভাবই অন্ধকার'—ইহা হইতে বিভিন্ন ব্যাখ্যা সাধারণে করিতে চাহে না, কিন্তু এত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। আলোকের অভাবই অন্ধকার সত্য, কিন্তু একথা স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে সৃষ্টির প্রাচীনতম ভিত্তিই অন্ধকারের উপর? কেমন করিয়া?—যখন সূর্য্যেই একমাত্র আলোকাধার এবং অন্যান্য গ্রহমণ্ডলীর জ্যোতিঃ তাহারই আলোক লইয়া (তাহাদের নিজস্ব কিছুই নাই) তখন সেই আলোকপিণ্ড সূর্য্যের রচনা-পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত কল্পনা করিতে হইলে, আমরা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখি না! তাহা হইলে, অন্ধকার হইতেছে সৃষ্টির আদি অথবা, আপনা হইতে উদ্ভূতা এক ধ্যান-ধারণাতীতা মায়াবিনী, যে আপনার অঞ্চলে বিশ্ববৈচিত্র ঢাকিয়া রাখিতে চায়। এখন আমাদের গল্পে ফিরিয়া আসা যাকঃ—

বিজ্ঞান আজও আবিষ্কার করে নাই বা ইতিহাসও একথার সাক্ষ্য দেয় না—কিন্তু এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্ব প্রথমে একটী মাত্র সাম্রাজ্য ছিল এবং তাহা একজন শাসন-কর্ত্রীর দ্বারা শাসিত হইত; এই শাসন-কর্ত্রীর নামই 'অন্ধকার।" তাহার শাসন প্রণালীর বিশেষ গুণ এই ছিল যে তৎকালীন প্রজাবর্গ কোন প্রকার অভাব বোধ করিতে না পারায় কাহারও কোন অভিযোগ ছিল না। এরূপ হইবার বিশেষ কারণ এই যে, তাহারা এক রাজ্ঞীর অবর্ণনীয় রূপ ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব দেখিতে পাইত না। নানাপ্রকার দ্রব্যাদি না দেখিলে অভাববোধ জন্মে না—অভাব বোধ না জন্মিলে, সুখ দুঃখের তারতম্য বুঝিতে পারা যায় না। সুখ দুঃখের অনুভূতি হীনতার নামই আবার শান্তি, সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় যে তাহারা শান্তিতে ডুবিয়া ছিল। এই সময় কোন এক অজ্ঞাত সর্ব্বশক্তিমান রাজদ্রোহী? একটী জ্যোতিষ্কপিণ্ড রচনা করিয়া অনন্ত ব্যোমপথে ছাড়িয়া দিলেন! এই আলোক পুঞ্জের আকস্মিক আবির্ভাবে বিস্ময়-স্তম্ভিতা অন্ধকার রাজ্ঞী ভয়ে ভয়ে তাঁহার গমন পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে এই জ্যোতিষ্ক অন্ধকারের অধিকার গুলি জয় করিয়া লইতে লাগিলেন।" এই আত্মপ্রভাব-বিস্তার-যুদ্ধে ছিন্ন তাঁহারই তেজোরাশি হইতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহাদির সৃষ্টি এবং এই তেজোপিণ্ডের নামই-সূর্য্য।

এত অত্যাচারেও কিন্তু 'অন্ধকার' তাহার চিরাধিকৃত সাম্রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে পারিল না, অথবা যাহা সৃষ্টির আদি তাহার বুঝি বিনাশ নাই—তাই সূর্য্যালোকের তীব্রতা অসহ্য হইলেও, শত্রুকে লুকাইয়া সাম্রাজ্ঞী 'অন্ধকার-প্রকোষ্ঠে' আসে, মুক্ত কল্পা ধরিত্রীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে, এই নূতন বিপ্লবের কূলে দাঁড়াইয়া পুরাতনের কথা ভাবে, স্মৃতির

মর্ম্মন্তুদ দংশনে পীড়িতা হয়, আবার নীরবে নীরবে চলিয়া যায়। ধরিত্রীকে অন্ধকার ভালবাসে? হাঁ—বাসেই ত; নহিলে সুবিধা পাইলেই তাহার নিকট ছুটিয়া আসে কেন?—কিন্তু শত্রু কন্যাকে সে কেন এত স্নেহ দেয়? কারণ ভালবাসা যাহার স্বভাব, তাহার নিকট শত্রু মিত্র জ্ঞান নাই, কারণ পিতৃ-পরিত্যক্তা তনয়ার বিয়োগ ক্লিষ্টা ম্লানমুখখানি দেখিয়া অন্ধকারের মমতাপূর্ণ হৃদয় তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে নাই। ধরিত্রীও অন্ধকারের অযাচিত করুণায় এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার মুখ না দেখিয়া থাকিতে পারে না। আজও সূর্য্যদেব আসেন, আবার আপন গন্তব্যপথে ছুটিয়া যান, আজও স্নেহের আকর্ষণে সহস্রকরে তনয়াকে টানিতে চান, (হায়, স্নেহ কি মুছিবার।) আজও তনয়ার প্রীতির জন্য শত শত করুণাধারায়, শত শত ভূষণ মালায় তাহাকে প্লাবিত ও সজ্জিত করেন, তথাপি ধারিত্রী অন্ধকারকে না চাহিয়া থাকিতে পারে না। এদিকে, প্রথম-দর্শনে যে আকস্মিক তেজ দেখিয়া ভীতি সঞ্চার হইয়াছিল, সে ভীতি সংস্কার আজও বদ্ধমূল আছে বলিয়াই সূর্য্যোদয়ে লুকাইয়া থাকে—ধরিত্রীও শ্যামলত-রু-অঞ্চল বিছাইয়া তাহার সখীটাকে লুকাইতে যায়, তথাপি তাহাকে একেবারে বিদায় দিতে পারে না। অন্ধকারও তাহার কতকগুলি অঙ্গাভরণ সখীকে স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ দিয়া, যেখানে পায় সেই খানেই পলাইতে চায়; বসুধার শ্যাম অঞ্চলে আবরিত অন্ধকারের এই আভরণ-গুলিকে আমরা সাধারণ চক্ষুতে দেখি—'ছায়া'।

তপন তনয়ার সহিত সখিত্বে আবদ্ধ হওয়ার পর হইতে, প্রথম সূর্য্য-দর্শন-ভীতি বুঝি অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে, তাই সৌরকরের তেজটুকু তারকাদিতে জ্যোতিরূপে প্রতিবিম্বিত দেখিলে সে সাহসে ভর করিয়া আপন কৃষ্ণ কবরীতে তাহা গুজিয়া রাখে, অথবা কখনও কখনও তপনতেজ প্রতিফলিত জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রখানি লইয়া আপন ললাটে টিপরচনা করে। অন্ধকার সখীর এই বেশভূষা-সজ্জিত অবস্থাকে ধরণী আদর করিয়া নাম দিয়াছে "নিশা"। পাছে বসুধার মনে কষ্ট হয় ভাবিয়া অন্ধকারও সখী-প্রদত্ত আদরের নাম লইতে আপত্তি করে নাই বটে, তথাপি তাহার প্রকৃত রূপ ইহা নয়। সে মধ্যে মধ্যে তাহার সেই বহু পূর্ব্বের একচ্ছত্রী সাম্রাজ্যের বিষয় ভাবে আর আলোকের দিকে চাহিয়া নীরবে কাঁদে; আমরা সাধারণ চক্ষে সন্ধ্যায় ও ঊষায় এ অশ্রু দেখিয়াও বুঝিনা বলিয়াই ইহার নাম দিয়াছি—নীহার!

অন্ধকার! অন্ধকার!! অন্ধকার!!! কত রহস্য ইহার বক্ষে লুকায়িত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; বিশ্বের আদিপুরুষকে চিনিতে হইলে বুঝি সৃষ্টির আদিকে প্রথমে জানা প্রয়োজন এবং এইজন্যই ধ্যান সাধনা, জপ তপ প্রভৃতি নিমীলিত নেত্রে-অন্ধকারকে সম্মুখে রখিয়া! সৃষ্টির যত সৌম্য গাম্ভীর্য্য, বিরাট নিস্তব্ধতা, একগ্রতা প্রভৃতি—তাহা সাম্রাজ্য বিচ্যুতা অন্ধকার আজও আপনার অঞ্চলে লুকাইয়া রাখিয়াছে, এই সমস্ত উপকরণ গুলি বাহ্য দৃষ্টিতে অনুভব করা যায় না বলিয়াই

অন্ধকারের প্রকৃত ছবি চিনিতে অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। বাহ্যদৃষ্টিতে আমরা যে অন্ধকার দেখি, তাহা ধরণীর মনস্তুষ্টির জন্ত তাহার সজ্জিত বেশমাত্র-কিন্তু তাহার প্রকৃত বেশ যাহা, তাহাতে শুধু গাঢ় আঁধার অথচ তাহার ভিতরও দিব্য আলোক—শুধু দুঃখ, অথচ তাহাই পূর্ণ শান্তি-শুধু ছায়াময় শুধু শূন্যময়—অথচ সে ছায়া ও শূন্যতার অন্তরালে-তেজোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়, বিশ্বের আদিপুরুষের প্রতিভামণ্ডিত মূর্ত্তি! এদৃষ্টি বাহিরের নয়-অন্তরের; এ আলো সূর্য্যের নয়-সূর্য্যের-স্রষ্টার; এঅন্ধকার অজ্ঞানতা নয়—জ্ঞানের পথ।

তবে দাঁড়াও তাপস, দাঁড়াও যোগী! তোমরা নিমীলিত নয়ন সন্মুখে দেখ শুধু অন্ধকার অন্ধকার! অন্ধকার!! আমরা সংসারের জীব—আমরাও দেখি স্তরে স্তরে অন্ধকার—তাহার ভিতর জীবন মরণ গাঁথা—তাহার ভিতর ইহলোক পরলোকের ছায়া—তাহার ভিতর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উজ্জ্বল ছবি!

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ ঘোষ।

---

## সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—:*:—

সোনার সংসার। কোহিনুর রঙ্গমঞ্চে এই পুস্তকখানির অভিনয় হইতেছে। আমরা জনৈক বন্ধুর অনুরোধে ইহার অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম; অভিনয় দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইয়াছি। প্রত্যেক সংসারিকে আমরা এই অভিনব পুস্তকের অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এরূপ পুস্তকের যত অভিনয় হয়, ততই মঙ্গল। গ্রন্থকার অনেক গুলি চরিত্র চিত্রণে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হউন।

গৃহস্থ। একখানি নব প্রকাশিত মাসিক পত্র, কলিকাতার ইটালী হইতে প্রকাশিত, আমরা ইহার দুই সংখ্যা পাইয়াছি। "গৃহস্থ" গৃহস্থের উপযোগী হইয়াছে; মূল্য অল্প, ছাপা ও কাগজ সুন্দর; দুই একটী প্রবন্ধ নির্ব্বাচনও মন্দ হয় নাই। এক্ষণে নবীন সহযোগী দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিলে আমরা সুখী হইব।

তিলি বান্ধব। একখানি মাসিক পত্রিকা, তিলি জাতির ইতিবৃত্ত প্রকাশ করা এবং তিলি সমাজের উন্নতি বিধান করাই পত্রিকা খানির উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অতীব প্রশংসনীয় কিন্তু বড়ই অনিয়মিত প্রকাশ হইতেছে, ইহাতে কি পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না। আর তিলি জাতির এত কি ইতিহাস আছে যে চিরকাল ধারাবাহিক রূপে তাহা "তিলি বান্ধবে" প্রকাশিত হইবে?

হিন্দু সখা। একখানি মাসিক পত্রিকা, আজ দুই বৎসর বেশ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। প্রতিমাসে হিন্দু ধর্ম্মের বহুবিধ গবেষণায় পত্রিকাখানির কলেবর পূর্ণ হয়। কিন্তু পত্রিকার কলেবর এত ক্ষুদ্র যে স্থানাভাবে ইহা আপন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিতেছে না। আশাকরি, পরিচালকবর্গ সত্বর এই অভাব মোচন করিয়া পত্রিকাখানিকে সাধারণের প্রিয় করিতে চেষ্টা করিবেন। আমরা সহযোগীর দীর্ঘ জীবন ও ক্রমোন্নতি প্রার্থনা করি।

আলোচনা, ৯ম সংখ্যা, পৌষ ১৩১৬ সাল।

# শিবস্তোত্র।

—:০:—

মহা. হাত্মানং মহাযোগী মহেশ্বরং
মহাপাপ হরং দেবং মকারায় নমোনমঃ।

নমঃ নমঃ শঙ্কর, শশাঙ্ক শেখর,
নমঃ নমঃ বাঘাম্বর হে।
পিনাক ধারণ, সঙ্কট তারণ,
ভবশিব শুভঙ্কর হে॥
জয় আশুতোষ, পরেশ মহেশ,
ভবেশ বৃষবাহন হে।
স্মর শর ভঙ্গ, ভূত-প্রেত-সঙ্গ,
ভূতনাথ নাম ধারী হে॥
গলে হাড়মালা, হরিনামে ভোলা
প্রমথ সনে প্রমত্ত হে।
দীর্ঘ জটাজুট, কণ্ঠে কালকূট,
নীলকণ্ঠ বিষপানে হে॥
অজর অমর, শোক তাপ হর,
কৈলাস শিখর বাসী হে।
গিরিসুতা পতি, অগতির গ[illegible]
শমন ভয় বারণ হে॥
তুমি [illegible], [illegible] দেহ পদ
আকিঞ্চন তব পায় হে।

যাব ভবপারে, বড় আশা করে
লয়েছি তব শরণ হে॥
মায়ামুগ্ধ জীবে, তারিবারে ভবে,
তোমাবিনা কেবা আর।
লয়েছি শরণ, অনাথ-শরণ,
লহগো আমার ভার॥
শমন নিকটে, এস হৃদি পুটে,
মহাকাল কাল অরি।
ডাকি বারে বার, এস একবার,
ভবপারের কাণ্ডারী॥
তারক ব্রহ্ম নাম, করো অবিরাম,
শুনি শ্রীমুখে তোমার—
ধন্য হব আমি, ওহে অন্তর্যামী,
সুখে হব ভব পার।
অজ্ঞানান্ধ জীব, ডাকে সদাশিব,
অন্ধ ভয়ে ভব ঘোরে।
দেহ মঙ্গলপদ, জীবের সম্পদ,
সঘনে ডাকি তোমারে॥

সম্পাদিক।

# শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব।

পাণ্ডবদিগের ইতিহাস শ্রীকৃষ্ণের জীবনীর একটী প্রধানতম অঙ্গ। ইঁহাদিগের জীবনীর ঘটনাবলী ছন্দ ও যতির ন্যায় এরূপ গূঢ় ভাবে জড়িত যে, পরস্পরকে কিছুতেই পৃথক করা যায় না। বলিতে কি পাণ্ডবদিগের ঘটনা পরম্পরাই শ্রীকৃষ্ণজীবনীর প্রধান উপাদান। পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া দিলে কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব থাকে না, কৃষ্ণকে ছাড়িয়া দিলে পাণ্ডবদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত বলিয়া বোধ হয়। লৌকিক ও অলৌকিক উভয় ব্যাপারেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদিগের অতি নিকট অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখা যায়। একদিকে যশস্বিনী কুন্তী, অপর দিকে পুরাণ পুরুষ নরনারায়ণ ঋষি, এই উভয়বিধসম্বন্ধের রজ্জু স্বরূপ। কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষ্বসা। তাঁহার গর্ভে যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জ্জুন, এবং তদীয় সপত্নী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ পাণ্ডু মৃগবেশধারী মুনিশাপে বিষম মনোবেদনায় কাতর হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যৎকালে হিমাচলের অপর অংশে শতশৃঙ্গ নামক পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে তাঁহার এই সুরোপম পঞ্চ পুত্র উদ্ভূত হয়েন। [illegible] কুন্তীর কুমারী অবস্থায় এক কানীন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম কর্ণ। কর্ণ আশৈশব সূত অধিরথ কর্ত্তৃক লালিত ও পালিত। ইনি পাণ্ডবদিগের পিতৃব্য পুত্র দুর্য্যোধনের প্রিয়সখা। ভীম ও দুর্য্যোধন এবং অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ প্রায় একই সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পঞ্চম পাণ্ডবের জন্মের কিছুকাল পরেই পাণ্ডুর পরলোকগমন হয়। তাহাতে তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী মাদ্রী তাঁহার সহগমন করেন। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার পরেই শতশৃঙ্গস্থ মুনিগণ কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবকে লইয়া হস্তিনায় আগমন পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের হস্তে তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিলেন। সেই দিন হইতে পাণ্ডবেরা হস্তিনানগরেই লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। যথাকালে তাঁহাদিগের শৈশবোচিত সমস্ত সংস্কার সাধিত হইল। তাঁহাদিগের বিবিধ বিদ্যা শিক্ষার উপযোগী সমস্ত আয়োজন করা হইল। সর্ব্বাস্ত্রবিদ মহাত্মা দ্রোণ পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্র দিগকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সকল বিদ্যাতেই দুর্য্যোধন অপেক্ষা পাণ্ডবগণ অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করিয়া সকলের অনুরাগ ভাজন হইলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যো[illegible]দের আর পরিসীমা রহিল না। এইজন্যই পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট সাধন করিবার অভিপ্রায়ে সে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বহু [illegible] করিতে লাগিল। সেই সকল চেষ্টা নিতান্ত অন্যায় হইলেও এবং ধর্ম্মাত্মা বিদুর তৎসমুদয়ের প্রতিবাদ করিলেও স্বয়ং অন্ধরাজা তৎসমুদয়ের চরিতার্থতাসাধনে প্রিয়তম পুত্রকে নিবারণ করেন নাই। পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, কিন্তু দুর্য্যোধন অপেক্ষা পাণ্ডবদিগকে অধিকতর যশস্বী হইতে দেখিয়া তিনিও পুত্রের দুশ্চেষ্টার সহায়তা করিতে লাগিলেন এবং কূটমন্ত্রী কণিকের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরাদির ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্য্যোধনাদির পাণ্ডব বিদ্বেষের প্রথম ভয়াবহ বিষময় ফল জতুগৃহ দাহ। ইহার পূর্ব্বে ভীম

লেখকে, ছিদ্র প্রয়োগ প্রভৃতি অন্যান্য দুশ্চেষ্টা জীবিতাবস্থায় জতুগৃহ দাহের সমকক্ষ হইতে পারে না। এই জঘন্য ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার পুত্র ও বন্ধুগণের বিশ্বাসঘাতকতা ও নৃশংসতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পাণ্ডব সহায় পরম ধার্ম্মিক বিদুর সেই মহা বিপদে পাণ্ডবদিগের উদ্ধারের উপায় বিধান না করিলে ভারতবর্ষের ইতিহাস কিরূপ মূর্ত্তিধারণ করিত তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু জগতের ইতিহাসে যে সকল মহাত্মার অমর জীবনী সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত আছে, অনেক সময় বিপদ তাঁহাদের ভাবী সম্পদের সোপানরূপে পরিণত হইয়াছিল। পাণ্ডবদিগের পক্ষেও এই বিশ্বজনীন নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায় না। ফলতঃ এই জতুগৃহ-দাহই তাঁহাদিগের সৌভাগ্যোদয়ের প্রথম সোপান। ইহার পর হইতেই মহাত্মা বাসুদেবের শুভদৃষ্টি ইঁহাদিগের উপর পতিত হয়। কৃষ্ণের যে অকপট সমবেদনা চিরকাল পাণ্ডবদিগের জীবনীশক্তিরূপে অটলভাবে বিরাজ করিয়াছিল, এই জতুগৃহেই * তাহার প্রথম অঙ্কুরোদ্গম হয়। এই জতু-গৃহেরই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে যবনমন্ত্রী পাপাত্মা পুরোচনের সহিত দুর্য্যোধনের সৌভাগ্য লক্ষ্মীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ইহারই দিগ্‌দাহী অনল কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের ক্ষীণরেখা দূর হইতে দেখা যায়।

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে জতুগৃহ-দাহের সংবাদ দ্বারকায় উপস্থিত হইলে রামকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধানের নিমিত্ত চরগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদির সহিত তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না, তাহার কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। ফলতঃ পাণ্ডবেরা যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হইতে জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাহা জানিতেন। সেইজন্য তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ব্রাহ্মণবেশী পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া কিছুমাত্র বিস্মিত হয়েন নাই। দুর্য্যোধন সবান্ধবে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তথাপি ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদী লাভ করিতে এবং বৃকোদরকে বৃক্ষ হস্তে যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়াও চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদিগের সকলকেই চিনিতে পারিয়া বলরামকে বলিয়াছিলেন অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে লইয়া ভার্গবের কর্ম্মশালায় প্রবেশ করিলে বলদেব ও কৃষ্ণ অলক্ষিতভাবে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরের চরণবন্দনা করিয়া স্বীয় পরিচয় দিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে ইতঃপূর্ব্বে রামকৃষ্ণের সহিত যুধিষ্ঠিরের চাক্ষুষ আলাপ ছিল না। যাহাহউক পাছে অন্যান্য লোক পাণ্ডবদিগের পরিচয় পাইয়া দুর্য্যোধনকে বলিয়া দেয় এই ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ তথায় অল্পক্ষণ থাকিয়াই অগ্রজের সহিত আপনার শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন। তথা হইতে কুন্তীর পুত্রগণকে বিবিধ ধনরত্ন যৌতুকস্বরূপ প্রেরণ করিয়া তিনি দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই স্বয়ম্বর ব্যাপারে পাণ্ডবদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সৌহৃদ্য যেরূপ দৃঢ়ীভূত হইল ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

* যে বারণাবত নগরে এই জতুগৃহ হইয়াছিল, অনেকে অনুমান করেন, তাহা বর্ত্তমান প্রয়াগ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, বর্ত্তমান কর্ণালের উত্তরে তাহা স্থাপিত ছিল।

এই স্বয়ম্বরকাণ্ড শ্রীকৃষ্ণের সম্মান, মহত্ব ও ঔদার্যতার প্রধান মাপ-দণ্ড। এই স্থল হইতে তিনি যে তদানীন্তন ভারতে পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন এই স্থানেই তাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণবেশধারী অর্জ্জুন কর্তৃক দ্রৌপদী অর্জ্জিত হইলে সমবেত রাজন্যগণ ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। যখন ভীমের বিক্রমে গর্ব্বিত শল্যের দর্প চূর্ণ হইল, কৃষ্ণ তখন সকলকে সম্বোধন করিয়া ধীরভাবে বলিলেন "এই ব্রাহ্মণ ধর্ম্মানুসারেই দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন, সুতরাং ইহাঁর প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করা উচিত নহে।" তখন ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইয়া স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। দ্রৌপদীকে লাভ করিতে না পারাতে সমাগত ব্যক্তিমাত্রই অভিমান ও প্রতিজিঘাংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এমন কি অর্জ্জুনকে ব্রাহ্মণ জ্ঞান করিয়া ও তাহারা ক্ষমা করিতে পারে নাই, সেইরূপ অবস্থা কোন সামান্য ব্যক্তি ধর্ম্মের অনুরোধ করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে বলিলে কেহই তাহাতে কর্ণপাত করিত কি না সন্দেহ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একবার বলিবা মাত্র সকলেই নিবৃত্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ যদি এইরূপে নিবারণ না করিতেন, তাহা হইলে স্বয়ম্বর সভা হয়ত ক্ষত্রিয় রুধিরে প্লাবিত হইত, নতুবা পাণ্ডবগণ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় আর প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারিতেন না। এরূপ হইলে হয়ত অন্যান্য ক্ষত্রিয় ও পাণ্ডব—উভয় পক্ষেরই বিশেষ অনিষ্ট হইত।

শ্রীকৃষ্ণের মহত্ব ও উদারতার দ্বিতীয় কথা,—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে শ্রীকৃষ্ণ কি কন্যা-লাভের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন?—যদি তাহাই হয় তবে তিনি লক্ষ্য ভেদের একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন না? তবে কি কেবল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন? যদি তাহাই হয় তবে বলদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ অক্রূর সাত্যকি, উদ্ধব, হার্দ্দিক্য প্রভৃতি ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র আত্মীয় ও বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে কেন আসিলেন? বৃষ্ণিগণের ন্যায় এরূপ দৃঢ়-বল-সম্পন্ন এই স্বয়ম্বর স্থলে আর কোন রাজবংশেরই দেখা যায় না। অবশ্য ধার্ত্তরাষ্ট্র দুর্য্যোধনও এইরূপ বিপুল বল সমন্বিত হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগের দ্রৌপদী লাভ ভিন্ন অন্য অভিপ্রায় ছিল না; তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে কি এই স্বয়ম্বর ব্যাপারে পাণ্ডবদিগের চিন্তা তাঁহার মনে সংশয় প্রতিভাত হইয়াছিল? জতুগৃহদাহে পাণ্ডবেরা যে বিনষ্ট হয়েন নাই, তাহা একমাত্র বিদুর ও তাঁহার বিশ্বস্ত খনক ব্যতীত আর কেহ জানিতেন কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না।—হয়ত শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতেন। কৃষ্ণের উপাসক বলিবেন যিনি পরম যোগবলে ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছিলেন, যিনি ছায়ার ন্যায় নিরন্তর পাণ্ডবদিগের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেন, তিনি কেন সেই গূঢ় ব্যাপার জানিতে পারেন নাই, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? শ্রীকৃষ্ণ সকলই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে পঞ্চপাণ্ডব নিশ্চয়ই আগমন করিবেন; অর্জ্জুন তাহাতে জয়ী হইবেন এবং তজ্জন্য তাঁহার সহিত অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ

যুদ্ধ করিবে। পাণ্ডবগণ [illegible] ও [illegible] কেবলমাত্র আত্মের সহায়ে তাঁহারা বল বর্জিত দুর্দান্ত ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধে পারিবেন কি না এইরূপ সন্দেহ করিয়া হয়ত তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার মানসেই শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ বিপুল বল সহকারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নতুবা দ্রৌপদীকে লাভ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। অন্যান্য রাজপুত্র ও রাজপৌত্রগণ কামপরতন্ত্র হইয়া অধর দংশন পূর্ব্বক একমাত্র দ্রৌপদীকেই দেখিতে লাগিলেন, পাণ্ডবদিগের প্রতি একবার ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; কিন্তু বলদেব ও কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের মতাবলম্বী প্রধান প্রধান বৃষ্ণিগণ অন্ধকগণ ও যাদবগণ ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ দ্রৌপদীর উপর তাঁহাদের দৃষ্টি আসক্ত ছিল না। কৃষ্ণ পদ্মাভিমুখ গজেন্দ্রের ন্যায় দ্রৌপদী-অভিমুখ ও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি সদৃশ সেই পঞ্চপাণ্ডবকে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; পরে বলরামকে বলিলেন "আমার বোধ হয় ইনি যুধিষ্ঠির," ইনি ভীম, ইনি অর্জ্জুন, ইনি নকুল ও ইনি সহদেব।" বলরামও শনৈঃ শনৈঃ তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতমনে জনার্দ্দনের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, পাণ্ডবদিগের জন্যই কৃষ্ণ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে আগমন করিয়াছিলেন।

তিনি স্বয়ম্বরের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার পর যখন দেখিলেন যে অর্জ্জুনই দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন, তখন তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তিনি কৌশলে বিবাদভঞ্জন করিয়া বিবাদকে নিবৃত্ত করিয়া পাণ্ডবগণের পশ্চাৎ কুম্ভকার গৃহে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবেরা তিক্ষাজীবী নিরাশ্রয়, কৃষ্ণের অতুল ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার কথা; তথাপি তিনি যাচিয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সহায়তা করিবার নিমিত্ত বিপুল ধনরত্ন ও দাসদাসী পাঠাইয়া দিলেন। পাণ্ডবগণ ঐশ্বর্য্যশালী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং এই সময় উপহার তাহাদিগের বিশেষ উপকারে আসিল। সময় ভাল হইলে অনেকে যাচিয়া সম্বন্ধ পাতাইয়া যায়; কিন্তু দুর্ভাগ্যের সময় পরম আত্মীয়ও একবার খবর লইতে আসেনা। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ধার্ত্তরাষ্ট্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের নিকট সম্পর্কীয়; কিন্তু ইহারা পাণ্ডবদিগের প্রাণঘাতী পরম শত্রু, শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার তাহার ঠিক বিপরীত। পাণ্ডবগণ জতুগৃহদাহে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এই আশ্বাসে দুর্য্যোধন নিশ্চিন্ত, শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপদে তাঁহাদিগের কল্যাণ সাধন করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত। ইহা অপেক্ষা অধিকতর মহত্ত্ব আর কাহার চরিত্রে দেখা যায়?

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ।

---

# ভারতের জাতীয়তা।

তুমি একটী মানুষ,—তাহা সুন্দর, চিন্তাসম্পন্ন মানুষ—বরণীয় গৌরব, বস্তু, স্বর্গীয় রমণীর আস্পদ, তুমি একটী ভাব লইয়া, একটি চিন্তা-রেখায় চিত্তকে পরিবেষ্টিত করিয়া, এই পৃথিবীতে নাচিয়া বেড়াইতেছ, বাহিরের

রণের: আবার, অনবরত ছুটাছুটি করিতেছ—হাসিতেছ, আবার কিলকাল কাঁদিতেছ। তোমার হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত, রূপান্তরিত ও নবীভাবাপন্ন হইতেছে। হৃদয়ে আশা উৎসাহ, নৈরাশ্য, বিষাদ প্রভৃতির বিবিধভাব-তরঙ্গ প্রতিমুহূর্ত্তে উঠিতেছে আবার পড়িতেছে। তোমার চতুর্দ্দিকেই একটা অশান্ত কর্ম্মব্যস্ততা, মনোভীষ্ট সম্পূরণ-কামনা জনিত বেগবতী চঞ্চলতা, উদ্দাম বেগে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে—তোমাকে আন্দোলিত করিতেছে, ন চাই। তবে বিবিধ ভাব-বিবর্ত্তনে, চেষ্টার স্পন্দনে, অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু তোমার সকল চেষ্টা, আশা বাসনা ও মর্ত্তনের যন্ত্রসূত্র গুলি নিয়ন্ত্রিত করিয়া একটি অনির্ব্বচনীয় স্পন্দহীন অনন্ত সাধারণ ভাব-কার্য্য নিয়ামক বিশেষত্ব, অহরহঃ তোমার মধ্যে সগৌরবে বিরাজ করিতেছে; সেই বিশেষত্বটী অচল অটল বাস্তবতায় বিচঞ্চল হয় না, কিন্তু সেটাই তোমার সকল কার্য্যের, সকল চেষ্টার, সকল উদ্যম ও আকাঙ্খার পরিচালক ও নিয়ন্তা; তুমি সেই বিশেষ ভাবটীরই একটি ব্যক্ত প্রতিমূর্ত্তি, একটী সুপরিস্ফুট অভিব্যক্তি ও সুন্দর, সুগঠিত আকৃতি। যেমন তোমার প্রতি শিরায়, তোমার প্রত্যেক ধমনীতে উত্তপ্ত শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইয়া তোমাকে সঞ্জীবিত রাখিতেছে, যেমন তোমার পর্য্যায়ত মেরুদণ্ডের আশ্রয় তোমার এই ক্ষণধ্বংস দেহ কামনীর দেহটি ক্রমে ক্রমে সুপুষ্ট ও সবল হইয়া তোমাকে জাগতিক কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রতিনিয়ত ব্রতী করিতেছে, তেমনি সেই বিশেষ কার্য্যবিশেষরূপী অনন্তশক্তিমান বিরাট শক্তি তোমার মন-প্রাণে, সুপ্রোজ্জ্বলে প্রবুদ্ধ হইয়া তোমাকে জাগতিক কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রতিরত, প্রবর্ত্তনা ও বেগ দিতেছে। শোণিত বিহীন হইলে তুমি যেমন বাঁচিতে পার না, এই বিশেষ ভাবটি হারাইলেও তোমার সত্তা বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, যেমন মেরুদণ্ড-সাহায্য ব্যতিরেকে তোমার এই বিশাল দেহটা অটুট থাকিতে পারে না, তেমনি এই বিশেষ ভাবটী পরিচ্যুত হইলে, তোমার এই মানবীয় প্রকৃতির ভিত্তিটী ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

সাগর গর্জ্জিতেছে, লম্ফ, ঝম্প, করিতেছে, পাগলের ন্যায় দিশেহারা হইয়া, অন্তর্গূঢ় অরণ্যের হাহাকারবৎ গর্জ্জনে, চঞ্চল ফেণিল বক্ষোদ্ভূত ঊর্ম্মী আস্ফালনে প্রলয়ের অভিনয় করিতেছে, কিন্তু অন্তস্থলে গভীর শান্তি, অনন্ত গাম্ভীর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় বিক্ষোভ হীনতা - তুমি ভাবাবেগে হাসিতেছ কাঁদিতেছ, মর্ম্মান্তিক ক্রোধে জ্বলিতেছ, কষ্ট-তাড়নায় চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছ, কিন্তু নিবিষ্ট মনে অবলোকন কর, সেই বিশেষত্বটি, যাহাতে তোমার কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও মনোবেগের প্রবণতা নিহিত ও নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে সেই অখণ্ড সাধারণ ভাবটী নীরব নিষ্পন্দ, চাঞ্চল্য বিহীন ও অমলিন ভাবে প্রতিষ্ঠিত। যাহা ব্যক্তিগত জীবনে, যাহা একটী স্বতন্ত্র মানব প্রকৃতিতে, তাহাই আবার সমাজের অভ্যন্তরে, জাতির অন্তস্থলে। যাহা জাতিকে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত। যেমন তোমার জীবন একটি অনন্য সাধারণ আদর্শে গঠিত, একটি অভিনব বিশেষত্ব-ছন্দে মুদ্রিত, তেমনই

জগতের প্রত্যেক সমাজ ও প্রত্যেক জাতির চরিত্র এক একটি অনন্য সাধারণ আদর্শ ও বিশেষত্বে সংগঠিত এবং সংস্থাপিত। যেমন তুমি তোমার মধ্যে বিরাজিত অচল, অটল অনন্ত, গভীর, অচঞ্চল ও বিক্ষোভবিহীন একটি বিশেষভাবের অনুপ্রাণনে উত্তেজিত হইয়া, সেই ভাবানুযায়ী কার্য্যাবলীতে বাহ্য জগতে কর্ম্ম চঞ্চলের সৃষ্টি করিয়াছ ও করিতেছ—সভ্য জগতের প্রত্যেক সমাজ ও প্রত্যেক উন্নত জাতিই তেমনি একটা স্মরণাতীত কালাগত বিশেষ আদর্শ ও অনন্ত সাধারণ বিশেষত্বে জাতীয় মন্ত্র যন্ত্র সম্বদ্ধ ও স্থির রাখিয়া, ধীরতা সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে পাদক্ষেপ করিতেছে। আদর্শ ও জাতীয় শিক্ষার তারতম্যানুসারে প্রত্যেক বিভিন্ন জাতিই এইরূপ এক একটী বিশেষভাব ও চারিত্র জগত বিশেষত্বের অধীন এবং ইহাই তত্তৎদেশের জাতীয়তা অথবা জাতীয় জীবন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই জাতীয়তা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রকৃতি ও আদর্শ ভেদে বিভিন্ন প্রকারের। ইংরাজের যাহা জাতীয়তা, তাহা ফরাসীর জাতীয়ত্ব নহে, এবং অন্যান্য দেশের জাতীয়তা ভারতবর্ষের জাতীয়ত্ব, বলিয়া কখনই পরিগণিত হইতে পারে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড। প্রজারা সকল অত্যাচার অবাধে সহ্য করে, করভারে নিষ্পেষিত কর কথা নাই; দেশ শুদ্ধ লোক লইয়া জোর করে সিপাই কর, আপত্তি নাই; কিন্তু যেই সেই স্বাধীনতার উপর কেহ হাত দিয়াছে অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ হইয়া উঠিবে, কেউ কারুর উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পারে না, ইহাই ফরাসী চরিত্রের মূল মন্ত্র। জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, উচ্চবংশ, নীচবংশ, রাজ্য শাসনে, সামাজিক স্বাধীনতায় তাহাদের সমান অধিকার। ইংরেজ চরিত্রে ব্যবসা বুদ্ধি, আদান প্রদান প্রধান, যথা ভাগ, তার বিভাগ ইংরাজের আসল কথা, রাজা,—রাজার জাতি—অধিকারী, ইংরেজ ভালরূপে তাহা স্বীকার করে, কেবল যদি পয়সাটি গাঁট থেকে বা'র করতে হয়ত, তার হিসাব চাইবে। রাজা আছে বেশকথা মান্য কর, কিন্তু টাকাটি যদি তুমি চাও ত তার কার্য্য কারণ হিসাব পত্র, আমি দু'কথা বলব, বুঝিব, তবে দিব। হিন্দু শাস্ত্র বলিতেছেন, রাজনৈতিক, সামাজিক স্বাধীনতা-বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা—মুক্তি। এইটাই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য। বৈদিক বল, জৈন বল, বৌদ্ধ বল, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত, যা কিছু বল, সব ঐ খানে একমত। ধর্ম্মই ভারতের জাতীয়তা, ধর্ম্মই ভারতের রাজনীতি, ধর্ম্মই ভারতের সমাজনীতি, ভগবৎ অনুসরণই ভারতের জাতীয় চরিত্রের বিশেষ ভাব ও অনন্ত সাধারণ আদর্শ। এবিষয়ে নবীন ভারতের মন্ত্র নায়ক কর্ম্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ ইংরেজী ভাষাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—

'Each nation has its own peculiar method of wark. Some wark through social reforms, some wark through

* স্বামী বিবেকানন্দের "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।"

politics, some work through other lines. With us religion is the only ground through which we can move. The Englishman can understand religion even through politics. Perhaps, the American can understand Religion even through social reforms, but the Hindu can understand even politics when it is given through Religion. Sociology must come through Religion, everything must come through Religion. For that is the theme, the rest are the variations in the national life-music" *

এখন একটু বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে। রাজনীতি বল' সমাজনীতি বল, আর অন্য যেই নীতিই বলনা কেন ভারতবর্ষে তাহা ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে, ধর্ম্মের ছাচে গড়িয়ে তবে কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে হইবে। তাহা না হইলে ভারতে তাহা চলিবে না, গ্রাহ্য হইবে না, হইতে পারে না, কেননা ভারতীয় প্রত্যেক ব্যাপার ধর্ম্মের সহিত অচ্ছেদ্য ও নিগূঢ় ভাবে অনুস্যূত। ধর্ম্ম ভারতের জাতীয়তা বা জাতীয় জীবন। কিন্তু এই "ধর্ম্ম" পাশ্চাত্য Religion শব্দ দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবেনা। ভারতের ধর্ম্ম অতীব ব্যাপক, বিশ্বজনীন, সমগ্র জগত হিতকর, অতীব পবিত্র। Religion কিম্বা ঈদৃশ অন্য শব্দ দ্বারা এই পরম পবিত্র ধর্ম্মের আংশিক ভাব ও পরিস্ফুট হইতে পারে, আমাদের এমত বিশ্বাস নাই। অন্যদেশে Religion এর একটা কিছু সঙ্কীর্ণ অর্থ থাকিতে পারে, কিন্তু ভারতীয় আর্য্যগণ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ * এই দশটি লক্ষণযুক্ত সম্বলিত পবিত্র সাধনাকেই "ধর্ম্ম" অর্থে বুঝিয়া থাকেন।

এস্থলে আমাদিগকে আরও একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে, তাহা না হইলে এই বিশ্বজনীন, পরম মঙ্গলময় "ধর্ম্মের" ঠিক স্বরূপটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না; অপিচ, ভারতের জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত কিম্বা সম্যকরূপে বর্ণিত হইতে পারিবে না। এখন দেখা যাউক, এই যে দশগুণ-সমন্বিত সাধনারূপ ধর্ম্ম ইহার লক্ষ্য কি? হিন্দুত্বের অন্তর্গূঢ় মহামহিমাময় ভিত্তি পারমার্থিক স্বাধীনতা বা মুক্তির সার্থকতা কি? আর্য্য প্রকৃতির সামঞ্জস্যীভূত, সুনিয়ন্ত্রিত, পারম্পর্য্য বিভক্ত অথচ একই অচ্ছেদ্য সূত্র গ্রথিত সমগ্র সাধারণ ধর্ম্ম গৌরবের বিশেষত্ব কি?

হিন্দুধর্ম্মের লক্ষ্য "শুদ্ধম পাপবিদ্ধম" ব্রহ্ম; হিন্দুত্বের অন্তর্গূঢ় মহীয়ান ভিত্তির সার্থকতা বিশ্বারাধ্য মঙ্গলময় পরমেশ্বর, আর্য্য প্রকৃতির অনন্ত সাধারণ ধর্ম্ম গৌরবের বিশেষত্ব জগদ্ব্যাপী, জগতের মূলকারণ সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের প্রতি আকুলতাময়ী ভক্তি প্রবণতা। এই জগদ্ব্যাপী পরমেশ্বর আছেন কোথায়? সর্ব্বভূতে, সমগ্রজগতে, সমগ্র পৃথিবীময় ভগবান বিরাজ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, সমগ্র পৃথিবী, সমগ্র ভূত, সমগ্র সৃষ্ট, অদৃষ্ট, দৃষ্ট,

* Vide Swami Vivekananda's lectures.

* "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ধী বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণং" মনুস্মৃতি ৬।৯২

অদৃষ্ট, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সকল পদার্থ, প্রকীর্ণ পরমাণু কিম্বা প্রকাণ্ড সৌরমণ্ডল, উত্তুঙ্গ শৈলশ্রেণী, সুনীল অনন্ত প্রসারিত নভোমণ্ডল কিম্বা উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষোভিত সমুদ্র সমস্তই তাঁহাতে বিধৃত, প্রতিষ্ঠিত, বিরাজিত। এখন সমস্ত ভূতকে, সমগ্র জগতকে ভাল বাসিলে, ভগবানকে ভালবাসিলাম—সমগ্র জগতকে, সর্ব্বভূতকে আত্মবৎ মনে করিয়া, ইহাই ভগবানের দেহের বিস্তার এই ভাবে বিভোর হইয়া, তাহাদিগকে ভালবাসায় তৃপ্ত ও ভক্তিতে সম্পূজিত করিলে—আমার ধর্ম্ম হইবে, ঈশ্বর ভক্তি হইবে, মনুষ্যত্ব লাভ ঘটিবে, আর তাহা না করিলে আমার ধর্ম্ম হইবে না, ঈশ্বর ভক্তি হইবে না, মনুষ্যত্ব হইবে না, কিছুই হইবে না। এই জন্য কাজেই সর্ব্বভূতকে ভগবানের এবং সর্ব্বভূতময় ভগবানকে * দর্শন করিতে পারিলেই এই পবিত্র ধর্ম্মের মূল পত্তন আরম্ভ হইবে। সর্ব্বভূতে ভগবান আছেন, সর্ব্বভূতকে আত্মবৎ মনে করিয়া তাহাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি করিলেই ভগবানের পূজা হইবে, ঈশ্বর ভক্তি হইবে ও হিন্দুত্বের মূল সূত্র পাওয়া যাইবে। ফলে কি দাঁড়ায়? ভারতের আর্য্যগণ ব্রহ্মসম্ভোগ কামনায় বিশ্বপ্রেমিক হইয়া পড়েন। ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণতা ময়, নিকৃষ্ট সাম্প্রদায়িক গণ্ডী ছাড়াইয়া তাঁহাদের প্রেম ও ভক্তি, তাঁহাদের প্রীতি ও ভালবাসা, তাঁহাদের সর্ব্বভূতেসম দৃষ্টি ও আত্মবৎ জ্ঞান, বিশাল মানব পরিবারের উদ্দেশ্যে, এই সুবিশাল জগৎরূপী বিরাট পুরুষের সন্তুষ্টি কামনায় জগন্ময় ছড়াইয়া পড়ে। তখন জাতিগত, ধর্ম্মগত বা অন্যান্য স্বার্থঘটিত ভেদ বা বিসম্বাদ, ঈর্ষ্যা বা দ্বেষ, অসূয়া বা ঘৃণা, দম্ভ বা অহঙ্কার, সকল দুর্ব্বল ও ক্ষীণ বন্ধনই টুটিয়া যায়। সকলই ভাসিয়া যায় কেবল জগন্ময় সরলতা ময়ী প্রেম ও ভক্তির লহরী, সুখ ও প্রীতি, হর্ষ ও আনন্দের অনাবিল উচ্ছাস সর্ব্বজনীন আন্তরিকতা ও সার্ব্বভৌমিক সহানুভূতির মধুময় ভাব-প্রবাহ উচ্ছাসিত হইয়া উঠে। সমগ্র ভূতকে প্লাবিত করিয়া ফেলে।

তখন আত্মহারা ভারত সন্তান, বিশ্ব প্রেমের অক্ষয় ভাণ্ডারে লব্ধ-প্রবেশ হইয়া, সর্ব্বভূতময়, ত্রিজগৎব্যাপী, "সহস্রশীর্ষপুরুষ ও সহস্রাক্ষ" ভগবানের পবিত্র সুবিরাট কায়া অবলোকন করিয়া ভক্তি উচ্ছসিত কণ্ঠে, পবিত্রতা পূরিত নিষ্পাপ হৃদয়ে গাহিয়া উঠেনঃ—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে  
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষ সঙ্ঘান্।  
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ  
সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥  
অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং  
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম।  
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং  
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥  
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ  
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম।  
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরিক্ষ্য সমন্তাৎ  
দীপ্তানলার্কদ্যুতিম প্রমেয়ম॥

* "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি  
ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।"  
গীতা ২৬।৬

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পর নিধানম।
ত্বমব্যয়ং শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্তং পুরুষোমতমে॥
অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্য্যং
অনন্তবাহু শশি সূর্য্য নেত্রম।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম॥
দ্যাবা পৃথিব্যোরিদমন্তরংহি।
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্টাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যাথিতং মহাত্মন্॥
"অমীহি ত্বাংসুর সঙ্ঘো বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাং প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্তা মহর্ষি সিদ্ধ সঙ্ঘাঃ
স্তবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুকলাভিঃ॥
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে সাধ্যা
বিশ্বেহশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্ব যক্ষাসুর সিদ্ধ সঙ্ঘাঃ
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥"

একাদশাধ্যায়, গীতা।

তখন সমগ্র জগৎ, সুবিশাল মানব নিবাস ও সর্ব্বভূত পরিব্যাপ্ত এবং আচ্ছাদিত করিয়া, এক, অখণ্ড, দুর্নিরিক্ষ্য, অনির্ব্বচনীয়, অভাবনীয় অনন্ত সুবিরাট সত্বা—"অনন্ত বাহু'" "অনন্ত-বীর্য," কোটি শশি সূর্য্য-দীপ্তাক্ষি সমন্বিত, বাক্য মন ও চিন্তার অতীত মহান্ ভগবান্, তাঁহার ভক্তি-প্রেম-সঞ্জাত অশ্রু-পূর্ণ নেত্র পথে অচিন্ত্য রূপে প্রতিভাত হইতে থাকেন; এবং সেই ভক্তি বিহ্বলিত, ভগবৎ প্রেম-আসব-পান উন্মাদিত, ভাবাতিশয্য জনিত নিরুদ্ধবাক ভক্তের কণ্ঠে অস্ফুট, জড়িত ও বিশ্বজনীন প্রীতি গদগদ স্বরে, "জগত সুখের" এই অনুপম, স্বর্গীয়, সুধাবহধ্বনী অশ্রুতভাবে উচ্চারিত হয়ঃ—

"সোহহং সঙ্গীতে পূর্ণ বিশ্ব সমুদয়
জগতের সুখ যাহা
আমাদের সুখ তাহা
সকলে জগত সুখে সমর্পিলে প্রাণ,
ধরাতলে হয় কিবা, স্বর্গ অধিষ্ঠান *

এই স্থলে হিন্দুধর্ম্ম সম্যকরূপে ধর্ম্মত্ত্বা প্রাপ্ত হইল, এর পরে আর ধর্ম্মের কোন উচ্চতর, মহত্তর উদ্দেশ্য ও নাই—হইতে পারে না, এইখানে ধর্ম্মের গূঢ়তাৎপর্য্য ও স্বর্গীয়, মহান্ পরম পবিত্র বিশেষত্ব চরম সীমায় পৌঁছিল। ভারতের জাতীয়তা এইরূপ মহান ধর্ম্মের উপর স্থাপিত, সংগঠিত ও বিধৃত। এতক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম কথঞ্চিৎ অধিগত হইল—ভারতের জাতীয়তার উচ্চ দুর্নিরিক্ষ্য লক্ষ্যও বহুর্দ্ধ স্থাপিত, নিগূঢ় তত্ত্ব অংশতঃ হৃদয়-ঙ্গম করা গেল। ভারতের জাতীয়তা ধর্ম্মে, আর চিত্তশুদ্ধি ও পবিত্রতা মণ্ডিত হইয়া সর্ব্ব-ভূতে সমদৃষ্টি ও আত্মতুল্যজ্ঞান এবং পরম পবিত্র প্রেমের সাধনে ধর্ম্ম, কারণ সর্ব্বভূতে ভগবান আছেন। এইরূপে ভারত সন্তান বিশ্বপ্রেমিক, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, পবিত্রচিত্ত, শুদ্ধান্তঃকরণ ও অপূর্ব্ব, অলৌকিক জাতীয়তার অধিকারী। ভারতের জাতীয়তার উপর মঙ্গল-ময়, পরমেশ্বরের মঙ্গল্য আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক!

* "রৈবতক কাব্য," নবীন চন্দ্র।

প্রত্যেক দেশেই এই জাতীয়তা বিনষ্ট হইলে তাহার উন্নতি ব্যাহত ও অভ্যুদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তাহার গৌরব-বিভা পরিম্লান, জাতীয় একাগ্রতা ও জাতীয় অভিমান খর্ব্ব ও ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়, দৈব দুর্বিপাক বশতঃ ভারতবাসী তাহাদের এই অত্যুচ্চ, পবিত্র ও জগৎ-হিতকর জাতীয়তার মন্ত্রসূত্র বিস্মৃত হইয়া, আজ অবনত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা ভিন্ন ধর্ম্মা জাতিকেও ঘৃণা করিতে শিখিতেছে, দেশান্তর বাসীকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে পারে না, এমন কি আর্য্য প্রকৃতি ও ভারতীয় জাতীয়তার বিরোধী গুপ্ত হত্যা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অনার্য্য জন-উচিত আসুরী-ভাব-নিচয় সমাজের পবিত্র অঙ্গে এখানে সেখানে দুষ্ট-ব্রণের ন্যায় আত্ম প্রকাশ করিতেছে। স্বর্গোপম সুখ-শীতল সুরভি-সমীরণ প্রবাহিত হইয়া যে পবিত্র ভারতকে অবিরত বীজন করিতেছে, সেই পুণ্য পবিত্রতাময় আর্য্যভূমিতে, সেই বীর্য্যে বিশ্রুত, শৌর্য্যে প্রতিষ্ঠিত, কর্ম্মে গৌরবান্বিত ও জ্ঞানে সমুদ্ভাসিত জগতের অমরাবতী তুল্য ভারতীয় গরীয়ান সমাজে কোন পাপের ফলে এইরূপ তীব্র গরল পূরিত, ভেদ-বিষ দিগ্ধ, প্রাণান্তকর উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মূল হেতু বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও নিরাকরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জাতীয়তা কিম্বা জাতীয় জীবন অংশত ক্ষুণ্ণ হইলেই দেশ অধঃপতিত ও পিশাচ-লীলার রম্য-নিকেতনে পরিণত হয়। আমাদের জাতীয়তা পরিম্লান ও অবসাদ গ্রস্ত হইয়াছে নিশ্চয়ই—তাই দেশবাসী মনুষ্যত্ব বিহীন ও সমাজ অনাচার, বিভীষিকী ও উচ্ছৃঙ্খলায় ক্লিষ্ট ও ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ জাতীয়তার অবনতির কারণ গুলি বিশেষরূপে বুদ্ধিস্থ করিয়া, সে সকলের মূলোৎপাটন করিতে হইবে—তাহা হইলে সমাজ আবার জাগরিত হইবে, সুপ্ত, আদর্শ-ভ্রষ্ট ভারতবাসী পুনরায় প্রবুদ্ধ হইবে, দেহের ধূলি ঝাড়িয়া, অতীতের আদর্শ মস্তকে লইয়া, জাতীয়তার সর্ব্বজনীন বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া বিস্ফারিত বক্ষে, নবোৎসাহে জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যাইবে, দিকে দিকে সেই মহাজাগরণের স্পন্দন অনুভূত হইবে। ভারতের তমগুনাচ্ছন্ন, ম্রিয়মাণ ভাব বিদূরিত হইয়া বদন মণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। নিম্নে জাতীয়তার অবনতির কতিপয় প্রকট, অবশ্যস্বীকার্য্য ও মূলীভূত গুরুতর কারণ লিপি বদ্ধ ও তাহাদের অভ্যুদয়ের সম্পর্কে সংক্ষেপতঃ কিয়ৎ পরিমাণে লেখনী চালনা করিব। ভরসা করি, স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গ এতৎ সম্বন্ধে আংশিক ভাবেও বিবেচনা করিতে প্রয়াসী হইবেন। সেই গুরুতর ব্যাপারের সহিত স্বদেশ, স্বজাতি, এমন কি সমগ্র জগতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা ঠিক তেমনি গুরুতর ভাবে পর্য্যালোচিত হওয়া উচিত, আমরা ইহাই মনে করি। ভারতের জাতীয়তার অবনতির প্রধান ও প্রথম কারণ দেশের দরিদ্রতা—অন্নাভাব—অনশন জনিত ক্লেশ ও তজ্জনিত ভীষণ ব্যাধি প্রভৃতির আবির্ভাব। নীতি প্রবক্তাগণ বলিয়া থাকেনঃ—

"বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপ
ক্ষীণা জনা নিষ্করুণা ভবন্তি।"

ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি এমন পাপ নাই যাহা না করিতে পারে, এমন কার্য্য নাই যাহা তাহার অসাধ্য

এবং এমন কঠোর অনুষ্ঠান নাই, যাহা তদ্দারা অনায়াসে সম্পাদিত না হইতে পারে। পেটের জ্বালায় মানুষ আত্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, পুত্রহত্যা, পিতামাতা হত্যা, গুরুহত্যা, প্রভৃতি জঘন্য, সর্ব্বতোভাবে ঘৃণিত ও চিত্তভয়প্রদ লোমহর্ষণ পাপ অনুষ্ঠান ও অভ্রূভঙ্গে সাধন করিয়া ফেলে। জঠর জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হইলে, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহার্য্য না পাইলে, তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া গেলে, সুপেয় জল না পাইলে, মানুষ দুরিত দৃপ্তদানব মনুষ্যত্ব বিহীন, পশু ও বনচারী আমমাংসভোজী, অসভ্য জাতির অপেক্ষাও ভীষণ, হিংস্র এবং মানবোচিত ঔদার্য্য সম্পর্কে অধঃপতিত হইয়া থাকে। তুমি, মানব নিবাসে পশু দেখিতে চাও? ঐ যে অনশন ক্লিষ্ট, কঙ্কালসার দেহ সম্পন্ন নরাকৃতি তোমার নেত্র পথে নিপতিত হইতেছে, সেই তাহার একটী। তুমি মানব নিবাসে পুত্র হন্তা, মাতৃ হন্তা, সর্ব্বপ্রকার প্রিয়জন হন্তা, ভীষণ দানব অবলোকন করিতে চাও? ঐ যে শত ছিদ্র-সম্পন্ন মালিনাম্বর পরিহিত, তৈল শূন্য রুক্ষ কেশ শোভিত মস্তকে, প্রেতাকৃতি মানব উদর জ্বালায় ইতঃস্তত ছুটাছুটি করিতেছে, সেই তাহার একটি! তুমি মানুষের আকৃতিতে, মানুষ নির্ম্মিত গৃহ প্রাঙ্গণে, রোমাঞ্চকারী নারকীয় অভিনয় ও সর্ব্ববিধ ভীতির আবাস, শ্মশানের অরুন্তুদ বেদনা দায়িক দৃশ্য, নেত্র নিপীড়ক, প্রাণের প্রসন্নতা বিনাশক, মর্ম্ম পীড়ক, ভীষণ দ্বন্দ্ব দৃষ্টিগোচর করিতে চাও? ঐ যে নিরলঙ্কৃত পর্ণ কুটিরে, অনশন-জনিত অবসাদ-কাতর তীব্র অথচ করুণ মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতেছে, ঐ যে কতিপয় অস্থিচর্ম্মসার, জ্যোতি-হীন চক্ষুঃ, ক্ষুৎপীড়িত ব্যক্তি অসাড় ভাবে শয়ান রহিয়াছে আর চতুর্দ্দিকে অসংখ্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকও বালিকা ক্ষুধায় কাতর হইয়া অন্ন চাহি-তেছে; ঐ কুটিরই একটি শ্মশানঐ কুটিরই একটী নরক, আর ঐ শয়ান মৃতবৎ মানুষই শ্মশানের শব। তুমি অরোগে রোগ, সুস্থতায় ব্যাধি, অবিকৃত অঙ্গে, তুষানলবৎ অসহ্য দাহন প্রত্যক্ষ করিতে চাও? ঐ যে অন্নহীন, বস্ত্রহীন ক্লিষ্টকায় বুভুক্ষু দেখিতেছ, সেই অরোগে রোগী, সেই সুস্থ শরীরে দারুণ অন্নাভাব-ব্যাধি গ্রস্ত, সেই অবিরত অঙ্গে অহর্নিশ দারুণ তুষা-নলে দহ্যমান। ফলতঃ, বুভুক্ষিতের, নিকট ন্যায় অন্যায়, ভালমন্দ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কুনীতি সুনীতি কিছুই নাই—কিছুই থাকিতে পারেনা—থাকা কদাপি সম্ভাবিত নহে। আমাদের দেশে যে একটী প্রবাদ আছে "অভাবে স্বভাব নষ্ট" এইটী খুব খাঁটি কথা, এইটী খুব প্রকৃত. পরীক্ষা-সিদ্ধ, নিত্য সংঘটিত ও দৃষ্ট প্রবাদ।

ধর্ম্মের সহিত, ধর্ম্মাচরণের ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে,—সুস্থশরীর, প্রশান্ত চিত্ততা, অবিচলিত মতি ও অক্ষুব্ধ মানসিক চিন্তার নিকট ও নিগূঢ় সম্বন্ধ। একটীর অভাবে অন্যটীর বিদ্যমানতা একরূপ কেন; সর্ব্বতোভাবেই অসম্ভব। ধর্ম্মতত্ত্ব অতীব জটিল, দুরবগাহ্য দুষ্প্রবেশ্য। কুশাগ্রমতি ধীমানেরাই এই তত্ত্বালোচনা ও পরিচিন্তনে যোগ্য ও উপযুক্ত অধিকারী। কিন্তু যাহারা অনশন-জ্বালা ক্লিষ্ট, অন্নাভাব, দুশ্চিন্তা পীড়িত ও পরিবার পোষণ

দুর্ভবনা-ভার-নিপীড়িত, তাহারা ধর্ম্ম চিন্তা করিতে পারে না, তাহাদের নিকট ধর্ম্মানুষ্ঠান সুদূর পরাহত, অসঙ্গত, অলীক অনধিকার চর্চ্চা বলিয়াই অনুমিতি হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ—

শ্রীভূপতি চরণ চক্রবর্ত্তী।

---

# দাদোজী কোণ্ডদেব।

—ঃ•ঃ—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সাহজী অনেকদিন স্ত্রীপুত্রের সাক্ষাত না হওয়ায় পত্নী জীজী বাইকে এবং পুত্র শিবাজীকে বিজাপুর লইয়া যাইবার জন্য দাদোজী কোণ্ড-দেবকে পত্র লিখিলেন। তজ্জন্য বৃদ্ধ দাদোজী জীজীবাই এবং শিবাজীকে লইয়া বিজাপুরাভি মুখে যাত্রা করিলেন, পথে যাইবার কালে দাদোজ কোণ্ডদেব দেখাইলেন, দেখ শিব্বা! তোমার মাতৃভূমির, তোমার জন্মভূমির শোচনীয় পরিণাম দেখ। এই যে সুবিস্তীর্ণ ময়দান একবার দেখ, একবার মানস পটে এই লোমহর্ষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখ। কই, ইহাতে শস্য কই? এই শস্য পূর্ণ ময়দান সম্রাট আরঙ্গজেবের সৈন্য দ্বারা দলিত, তাঁহার অশ্ব দ্বারা মথিত এবং ভক্ষিত হইয়াছে। দেখ সুদূর প্রান্তর, শস্য নাই। কেবল মরুভূমি, কেবল মরুভূমি, বল শিব্বা! একবার বল, ইহাতে, তোমার প্রাণ কাঁদে কিনা বল?

চারণ সদৃশ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গণ্ডস্থল বহিয়া শোকাশ্রু বহিতে লাগিল, তিনি অশ্রুসম্বরণ করিয়া বলিলেন, শিব্বা! চল, অগ্রসর হও তোমাকে তোমার স্বজাতি, স্বদেশবাসী, তোমার জীবন মরণের সহচর, তোমারই ভ্রাতা ভগ্নীগণের অনশন ক্লিষ্ট কঙ্কাল সার দেহ দেখাইব। তাহাতে প্রাণ আছে কিন্তু আহার্য্য অভাবে বলহীন, চক্ষু কোটর গত। সেই মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখাইয়া আমার অভিযোগ বলিব, সত্যতা তোমার নিকট সপ্রমান করিব।

শিবাজী দেখিলেন-কোথাও অধিবাসীগণের পর্ণ কুটীরে খড় নাই, কোথাও আহারাভাবে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পুত্র কন্যা লইয়া স্নেহময়ী জননী ক্রন্দন করিতেছেন। কোথাও সামান্য অন্ন অন্নে, অন্নে বিতরিত হইতেছে কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। তিনি ইত্যাকার হৃদয় বিদারক দৃশ্যাবলী দেখিয়া মুসলমান জাতির উপর বড়ই বিদ্বেষ-পরায়ণ হইলেন এবং বলিলেন দেব! এই সকলই কি মুসলমানেরা করিয়াছে? বৃদ্ধ কোণ্ডদেব দীর্ঘায়ত লোচন বিস্ফারিত করিয়া উত্তর দিলেন-নিশ্চয়ই, আবার কে করিবে; সকল কার্য্যই বাদশাহ আরঙ্গজেবের সুশাসনের ফল। এই সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহারা বিজাপুর পৌঁছিলেন। তথায় পৌঁছিয়া শিবাজী—পিতার এবং বিমাতা তুকাবাইয়ের চরণবন্দনা করিলেন। সাহজী পুত্রের দেবরূপ দর্শন করিয়া বড়ই প্রীতি হইলেন। কয়েকদিন তথায় অবস্থানের পর বিজাপুর দরবারের প্রধান কর্ম্মচারী মুরার রাও প্রভৃতির সঙ্গে বালক শিবাজীর পরিচয় হইল। মুরার রাও বালকের নির্ভীকতা এবং বুদ্ধির প্রাখুর্য্যতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন।

ক্রমে ক্রমে শিবাজীর গুণ রাশি বিজাপুর নবাবের কর্ণগোচর হইল, তিনি শিবাজীকে দেখিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইলেন এবং সাহজীকে পুত্রসহ দরবারে আসিবার জন্য হুকুম করিয়া লোক পাঠাইলেন। শিবাজী দরবারে যাইতে হইবে শুনিয়া পিতাকে বলিলেন—বাবা!" আমি দরবারে যাইব না কারণ মুসলমান জাতি অতি নীচ জাতি আমি তাহাদের সেলাম করিতে পারিব না। তাহারা গোহত্যা করিতেছে, আমাদের ধর্ম্ম নিন্দা করিতেছে, এবং নানাপ্রকারে আমাদের দেশের অহিতকর কার্য্য করিতেছে। যেহেতু তাহারা সমগ্র হিন্দু জাতির শত্রু সুতরাং আমারও পরম শত্রু। এখানে আসিবার সময় দেখিলাম একজন মুসলমান একটি গোহত্যা করিয়া রাখিয়াছে, ইচ্ছা হইল, উহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলি। কিন্তু গুরু কোণ্ডদেবের অনিচ্ছায় সে কার্য্য করিতে পারি নাই—ইহা আমার পক্ষে দুঃখের কথা বলিতে হইবে। মুসলমানজাতি যতই শক্তি শালী হউক না কেন, আমি কিছুতেই উহাদের ভয় করিনা। সাহজী পুত্রের জাতি-বিদ্বেষ দেখিয়া চিন্তিত হইয়া বলিলেন,—বাপ শিব্বা। তোমাকে নবাবের দরবারে যাইতেই হইবে, নতুবা আমাদের মান সম্ভ্রম কিছুমাত্র থাকিবে না। শিবাজী যোড়হস্তে বলিলেন, আপনি পিতা, আপনি আমার উপাস্য দেবতা, আমায় মাপ করুন। আমি এমন কাজ কদাচ করিতে পারিব না। কারণ যে মস্তক পিতা মাতার পাদপদ্মে, গুরুর চরণে, এবং জননী স্বরূপনী, মাতৃভূমির উদ্দেশে বিক্রয় করিয়াছি, তাহা কদাচ বিজাতীয়, বিধর্ম্মীর নিকট নোয়াইব না। সাহজী উপায় না দেখিয়া জীজী বাইয়ের নিকট যাইয়া সমস্ত বিষয় বলিলেন। তিনি শিবাজীকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইলেন কিন্তু শিবাজী মাতার নিকট অনুপূর্ব্বিক বলিলেন। মাতাও কিছু করিতে না পারিয়া বৃদ্ধ কোণ্ড-দেবের নিকট সমস্ত বলিলেন।

বৃদ্ধ দাদোজী শিবাজীকে ডাকিয়া বলিলেন, শিব্বা! তুমি দরবারে যাইবে না কেন? তিনি বলিলেন, দেব! দরবারে যাইলে মুসলমানকে সেলাম করিতে হইবে এবং যে মস্তক পিতামাতা, গুরু এবং জন্মভূমির জন্য উৎসর্গীকৃত করিয়াছি, তাহা কি প্রকারে অন্য জাতির চরণে লুণ্ঠিত করিব।" দাদোজী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, শিব্বা! তোমার সমস্ত ভুল হইয়াছে। একজন মুসলমান যদি তোমার অন্যায় করে, তাই বলিয়া কি তুমি সমস্ত মুসলমানকে দোষী করিবে। তাহা কদাচ হইতে পারে না। আমি জানি কোন জাতিকে ঘৃণা করিতে নাই, তবে ব্যক্তি বিশেষকে তাহার কার্য্যাবলীর দোষ দেখিয়া ঘৃণা ও অবহেলা করিতে হয়। তাই বলিয়া একের দোষে সমস্ত জাতিকে দোষী করা, বাতুলের বা মূর্খ লোকের কার্য্য। মুসলমানগণের মধ্যে এমন সাধু উদার ব্যক্তি আছেন, যাহারা ধর্ম্মের অবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তুমি বাদশাহ আরঙ্গজেবের জন্য কি সেই "আদর্শ চরিত্র বিশিষ্ট মুসলমানগণকে মান্য করিবে না, বা তাঁহাদিগকে সম্মান দেখাইবে

না। যাঁহারা গুণীব্যক্তি তাঁহারা প্রচ্ছন্নভাবে আবস্থান করেন, তাঁহারা মান সম্ভ্রমের ধার ধারেন না। তাই বলিতেছি-তুমি বালক যখন এহেন গুণী লোকগণকে চিনিয়া লইতে পারিবে না, তখন তাঁহাদের দোষ দিতে ও পারিবে না। তজ্জন্য আবার বলিতেছি নবাব বাহাদুর যদি সাধু ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তি হন তাহা হইলে কেন তাঁহার অমান্য করিবে? যাও তুমি এখনি যাও, যাইযা দরবার দেখিযা আইস।

শিবাজী বলিলেন, দেব! দরবারে যাই-তেছি কিন্তু সেলাম করিতে পারিব না। কারণ এই নবাব তত দুর সাধু ব্যক্তি নন, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। সাহজী এই সব কথা নবাবের প্রধান কর্ম্মচারী মুরার রাওকে জানাইলেন। তিনি অভয় দিয়া বলিলেন, আপনি শিবাজীকে সঙ্গে করিয়া দরবারে আনিবেন, আমি সমস্ত ঢাকিয়া লইব।

যথাসময়ে সাহজী পুত্রসহ দরবারে আসিয়া সেলাম করিয়া বসিলেন। বালক শিবাজী সেলাম না করিয়া পিতার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন নবাব মুরার রাওকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন—হুজুর! শিবাজী বালক, অনভিজ্ঞতা বশতঃ সেলাম করে নাই। নবাব প্রীত হইয়া শিবাজীর সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। শিবাজীর অমৃতবর্ষী কথায় নবাব আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে বহুমূল্য অলঙ্কার এবং সম্মান-পরিচ্ছদ দিয়া বিদায় দিলেন। তিনি বাটী আসিয়া বস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পবিত্র হইলেন।

এই স্থানেই বালক শিবাজীর দশবৎসর বয়ক্রম কালে শিরকবংশের পরমা সুন্দরী কন্যা সইবাইয়ের সহিত শুভপরিণয় কার্য্য শেষ হইয়া গেল।

সাহজী পুত্রকে রাজধানীতে রাখা নিরাপদ নহে, বিবেচনা করিয়া দাদোজী কোণ্ডদেবের অধীনে পুনরায় পুণায় প্রেরণ করিলেন। বৃদ্ধ বহুদর্শী ব্রাহ্মণ দাদোজী কোণ্ডদেব জীজীবাই শিবাজী এবং নববধূ সইবাইকে লইয়া পুণায় আগমন করিলেন।

শিবাজী পাছে স্লেচ্ছ হন, এই ভয়ে দাদোজী, অহঃরহঃ নানাবিধ শাস্ত্রীয়, রাজনৈতিক, বৈষয়িক এবং গার্হস্থ্য উপদেশ দিয়া শিবাজীর চপল চিত্তকে অন্য গতিতে লইয়া গেলেন। উত্তর কালে বীরপত্নী সইবাই মহাভাগ শিবাজীর অনুরূপ স্ত্রীই হইয়াছিলেন। একদিন দাদোজী বলিলেন—শিব্বা! তুমি অধম নিকৃষ্ট মবলা-গণকে ঘৃণা কর? শিবাজী বলিলেন না। কোণ্ডদেব বলিলেন—আচ্ছা! তুমি কেমন ঘৃণা কর না তাহার পরীক্ষা দাও। অদ্যই দশজন মবলা বালকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া তাহাদের আমার নিকট আনয়ন কর। শিবাজী তাহাই করিলেন। পরবর্ত্তী কালে এই মবলা-গণই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া ভারতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধ দাদোজী মবলাগণকে ডাকিয়া শিবাজীর সহিত তাহাদের যুদ্ধ বিদ্যা শিখাইতেন। এইরূপে মবলাগণের সহিত শিবাজীকে অচ্ছেদ্য প্রেম রজ্জুতে বাঁধিয়া ভবিষ্যৎ আশার পথ পরিষ্কার করিলেন।

ইহার পর কোণ্ডদেব শিবাজীর চরিত্র গঠন করিতে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি শিবাজীকে ডাকিয়া উপদেশ দিলেন যে, তোমার পত্নী ভিন্ন সকল স্ত্রীকেই তোমার মাতা জীজীবাইয়ের মত জ্ঞান করিবে। কদাচ অন্য দৃষ্টিতে পরস্ত্রীকে দেখিবে না। তাহা হইলে ভবিষ্যতে তুমি জগৎ পিতার করুণা লাভে সক্ষম হইবে এবং তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদে অচিরে তোমার সুবিস্তীর্ণ রাজ্য লাভ ঘটিবে। দেখ! যেন তোমার বৃদ্ধ গুরুর বাক্য ভুলিও না। শিবাজী অবনত মস্তকে সমস্ত শুনিয়া গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

বার্দ্ধক্যবশতঃ দাদোজী কোণ্ডদেব রাজ কার্য্য পরিভ্রমন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তজ্জন্য অতিরিক্ত কর্ম্মচারি নিয়োগের জন্য সাহজীকে লিখিয়া পাঠাইলেন। সাহজী দাদোজীর কথামত শ্যামরাও নীলকণ্ঠকে পেশওয়া; রঘুনাথ বল্লালকে সবনীস, সনোপণ্ডকে দবীর, বাল কৃষ্ণ পণ্ডকে "মজুমদার" উপাধী দিয়া রাজ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। যথাসময়ে ইহারা পুণায় আসিয়া পৌছিলে দাদোজী উপদেশ ও শিক্ষা দিয়া স্ব স্ব কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়াদিলেন যে, যেন কেহ পদ গৌরবে মুগ্ধ হইয়া হৃদয়হীন না হন এবং বিচার কালে কঠোরতার সহিত যেন স্নেহশূন্য না হন অর্থাৎ সকল দিক বিবেচনা করিয়া তবে দোষীকে শাস্তি এবং নির্দ্দোষীকে খালাস দিবেন। তিনি এই সমস্ত কর্ম্মচারীদের হস্তে স্বীয় কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ঈশ্বর চিন্তায় কাটাইবার জন্য মনস্থ করিলেন। ঠিক এইসময় তিনি শিবাজীর জন্য পুনায় এক সৌন্দর্য্যশালী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান—ইহাই সেই ইতিহাস-বিখ্যাত "রঙ্গ মহাল"। এই স্থান শিবাজীর বড়ই প্রিয় ও মনোরম ছিল। তিনি অনেক সময় মাতা এবং পত্নীগণসহ এই স্থানে কালযাপন করিতেন।

দাদোজী—স্বীয় মৃত্যুর আর সময় নাই বুঝিয়া শিবাজীর সমস্ত কার্য্য অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়া ছিলেন। তিনি বালক শিবাজীকে এবং মবলাগণকে নানাবিধ যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়া এক অজেয় দল করিয়া তুলিলেন।

কোণ্ডদেব সব করিয়াছিলেন কেবল তাঁহার প্রিয় ছাত্রের জন্য দুর্গ করিয়া দিতে পারিলেন না। সেইজন্য বলিলেন, শিবা! তুমি দুর্গ প্রস্তুত কর, আমার জীবনে আর কুলাইবে না। উন বিংশ বর্ষীয় বালক শিবাজী তাঁহার সহচর; নিকৃষ্ট মবলাগণ সহ তোরণাদুর্গ * আক্রমণ করিয়া প্রধান দুর্গ রক্ষককে কিছু টাকা দিয়া বিনা রক্তপাতে দুর্গটি জয় করিয়া ফেলিলেন এব অতি ক্ষিপ্রতার সহিত উক্ত দুর্গ সংস্কার করিয়া যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ করিলেন। কথিত আছে যে উক্ত দুর্গ সংস্কার কালে শিবাজী অনেক স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আবার ইহার এক ক্রোশদূরে মুরবাদ নামক পর্ব্বতোপরি অভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করাছিলেন এই দুর্গা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভারত বিখ্যাত "রায়গড় বা রাজগড়।"

* তোরণাদুর্গ পুনার ১৮ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম।

যখন দুর্গ নির্ম্মাণের কথা সাহজীর কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি দাদোজীকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে শিবাজী নবাবের বিনানুমতিতে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছে। ইহাতে আমার সমূহ ক্ষতি হইবে, হয়তঃ আমি নবাবের আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারি। অতএব বালক শিবাজীকে একার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবেন। দাদোজী সাহজীর বিপদাশঙ্কায় ভীত হইয়া শিবাজীকে উপস্থিত এ কার্য্য হইতে নিবস্ত করাইলেন এবং বলিলেন পৈতৃক বিষয়ের উন্নতি করিতে চেষ্টা কর বা যত্নবান হও।

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ দাদোজী কোণ্ডদেব সপ্ততি বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়া বড়ই রোগ-প্রবন হইয়া পড়িলেন। তিনি আর অধিক দিন বঁচিবেন না, ইহা শিবাজী ও তদীয় জননী জীজীবাইয়ের নিকট প্রকাশ করিলেন। ইহা শুনিয়া মাতা পুত্রে তাঁহার যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন,—আর স্বয়ং মহাদেও আসিলেও বঁচিব না, আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। এখন পরম পিতার চরণতলে স্থান পাইলে এ অধম চিরতরে সুখী হইবে। ইহাই এ দীন হীন অভাজনের শেষ প্রার্থনা। তবে আমার আসন্ন সময়ের পূর্ব্বে শিবাজী! তোমাকে কয়েটী উপদেশ দিয়া যাইব। তাহা সময়ে অসময়ে, সম্পদে বিপদে, সদাসর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

প্রিয় পাঠক! দাদোজীর অমূল্য উপদেশ সমূহ লিপিবদ্ধ করা কঠিন। তবে এস্থলে আমরা কতকগুলি উপদেশ লিপিবদ্ধ করিলাম।]

প্রথমেই তিনি বলিলেন,—বৎস শিবা! আমি বহু কার্য্যে-বহু অবস্থায় পতিত হইয়া অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; তাহা হইতে তোমাকে কয়েকটী কথা বলিতেছি। তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। তুমি মহাত্মা পণ্ডিত কুল-তিলক চাণক্যের শতাধিক শ্লোক বা উপদেশ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিবে এবং সেই মত চলিবে। ইহা ভিন্ন তুমি প্রজার অবস্থা স্বয়ং দেখিয়া আসিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা ঠিক করিয়া বিচার করিবে। আলস্যকে হৃদয়ে স্থান দিবে না। প্রজাগণকে নির্ধন ও মূর্খ করিওনা। কদাচ ধর্ম্ম বিষয় তর্ক বিতর্ক করিবেনা। পরস্ত্রীকে মাতার সমান জ্ঞান করিবে। শত্রু কে নিধন করিবার সময় তাঁহাকে মধুর ভাষে তুষ্ট করিও কিন্তু আপত্তি না থাকিলে ছাড়িয়া দিবে। বন্দীর উপর কোমল ব্যবহার করিবে এবং চাটুকারদের শত্রু জ্ঞান করিবে ও তাহাদের কথায় কণামাত্র বিশ্বাস করিবে না। কম আহার করিয়া ১০। ১৫ ক্রোশ ঘোড়ায় অথবা পদব্রজে যাইবে। ক্ষুদ্রকাজ বলিয়া কোন কাজে অবহেলা করিবে না। পণ্ডিতগণকে মান্য করিবে। আমি সব জানি, সব বুঝি এইভাব প্রকাশ করিবে না, মিতব্যয়ী হইবে অর্থাৎ কৃপনের ন্যায় ধন সঞ্চয় করিবে এবং উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তাহা ধীর ভাবে ব্যয় করিবে—স্মরণ রাখিও আয় বুঝিয়া ব্যয় করা উচিত। দেশকাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া-দণ্ড দিবে, ইহাতে বিদ্বান, ধনী নির্ধন, নিকৃষ্টকে সমান জ্ঞান করিবে। যাহার পক্ষে